Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি, কোনটা নিব,কেন নিব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলামা সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরেন জান্নাত বিনতে হাকিম

রোলঃ ২১৫০০১১৩২

১৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি, কোনটা নিব,কেন নিব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলামা সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরেন জান্নাত বিনতে হাকিম
রোলঃ ২১৫০০১১৩২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি, কোনটা নিব, কেন নিব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুরেন জান্নাত বিনতে হাকিম, আইডিঃ ২১৫০০১১৩২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলামা সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি, কোনটা নিব, কেন নিব” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলামা সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

নুরেন জান্নাত বিনতে হাকিম

আইডিঃ ২১৫০০১১৩২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
সংস্কৃতি কি?	৭
সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?	৮
অপসংস্কৃতি	১১
সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য	১২
ইসলামী সংস্কৃতির বিবর্তন ও রূপরেখা	১৪
প্রাক-ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি	১৭
ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা	২০
ইসলামী সংস্কৃতি কি?	২২
ইসলামী সংস্কৃতির উপাদান	২৩
ইসলামি সংস্কৃতির গুরুত্ব এবং কতিপয় বৈশিষ্ট্য	২৫
ইসলামী আদর্শের সংস্কৃতি	২৯
ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩০
ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো	৩২
ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব	৩৫
মুনাফেকীর ভয়	৩৬
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি	৩৮
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি	৩৮
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য	৩৯
পাশ্চাত্যে সংস্কৃতির আগ্রাসন	৪০
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি রোধে ইসলামিক সংস্কৃতি	৪৭
ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতি	৪৯
ইসলামী অর্থনীতি এবং পাশ্চাত্য অর্থনীতি	৫৪
উপসংহার	৫৭
তথ্যসূত্র	৫৯

ভূমিকা

মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে করে তোলে সুন্দর, সুচারু, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত। আর এই সংস্কৃতি যদি হয় সুস্থ ও সবল ধারার, তবে তার জীবনটা হবে সফল। সুস্থ ধারার সংস্কৃতির উৎস হলো ইসলাম। আর এর মূলে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামী সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোন সংস্কৃতি সুস্থ ধারার সংস্কৃতি নয়। ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে একটি মানবতাবাদী সংস্কৃতি। অন্যদিকে আধুনিক সংস্কৃতির মূলে রয়েছে ধর্মহীনতা, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনা, এতে নেই কোন মানবিকতা, নৈতিকতা ও শালীনতা।

সংস্কৃতির এমন কোনো বিভাগ নেই যেখানে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলনা। খ্রিস্টান দুনিয়া যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন ইসলাম জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যকে আলোকিত করেছে। গবেষণা ও মুক্ত চিন্তার বন্ধ দরজাকে মুক্ত করেছে। মক্কা-মদীনা, কুফা-বসরা, দামেস্ক থেকে স্পেন পর্যন্ত গ্রন্থাগারের পর গ্রন্থাগার বানিয়েছে। বানিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইতিহাস বলুন আর দর্শন বলুন কিংবা অনুবাদ শিল্প বলুন সবকিছুই তো মুসলমানদের অবদান। প্রাচীন বিজ্ঞানের শুরু থেকে সফলতার শীর্ষে আরোহণ পর্যন্ত সবকিছু মুসলমানদের হাতেই হয়েছে যখন ইহুদী-খ্রিস্টানরা নতুন আবিস্কার বা বক্তব্য সহ্য করছিলনা। বিজ্ঞানীদের জীবন্ত কবর দিচ্ছিল। তখন শব্দ বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যার মতো প্রাচীন বিজ্ঞানের এক একটি অধ্যায় আবিস্কার করে যাচ্ছে মুসলমানরা। সাহিত্যিক অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবদানের স্বীকৃতি কে না জানে। দর্শন শাস্ত্রে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল শীর্ষ স্থানীয়। ভূগোল, মানচিত্র বিদ্যায়ও মুসলমানদের অবদান ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ে।

বর্তমান সময়ে আমরা যে সংস্কৃতিকে আমাদের প্রকৃত সংস্কৃতি বলে মনে করি অর্থাৎ ইসলামী সংস্কৃতি বলে মনে করি তা আসলে ইসলাম তথা কুরআন-সুন্নাহ স্বীকৃত সংস্কৃতি নয়। এর অর্থ হলো আমরা মুসলিম জাতি বিশ্বে আজ যে সংস্কৃতিতে নিজেদের আপন করে নিয়েছি , তা হয়তো খ্রিস্টিয় সংস্কৃতি অথবা ইউরোপিয় ও আমেরিকান সংস্কৃতি তথা মানুষের মনগড়া মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি। আবার বিভিন্ন

জনপদে এই সংস্কৃতি পালন করে পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতি বলে। অন্যদিকে কেউ কেউ এই সংস্কৃতি পালন করে আলট্রা মডার্ণ (অত্যাধুনিক) হওয়ার জন্য।

রাসূল (সা.) এর জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন মক্কার কুরাইশদেরকে কালিমার দাওয়াত দিয়েছিল তখন তারাও বলেছিল আমরা কি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে তোমার এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করবো? অথচ আমরা অনেকদিন থেকেই এই ধর্ম পালন করে আসছি। সুতরাং পূর্ব-পুরুষদের সংস্কৃতিকে নিজেদের জন্য বৈধ সংস্কৃতি রূপে গ্রহণ করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই।

আজ বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানগণ যে সংস্কৃতি লালন করছে তা ইসলাম স্বীকৃত সংস্কৃতি নয়। এ দেশের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি ও আমরিকান সংস্কৃতি, যেগুলো হলো অসুস্থ ধারার সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা। আর এই সফলতা আসবে বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরণের মাধ্যমে। এই সংস্কৃতি এমন একটি নির্ভুল সমাজ কায়েম করতে চায়, যা হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ। এর জন্য প্রয়োজন উত্তম চরিত্র ও সৎগুণ।

মুসলিম হিসেবে আমাদের যে সংস্কৃতি গ্রহণ করা প্রয়োজন তাই আমরা লালন করবো। আর সেই সংস্কৃতি হলো ইসলামী সংস্কৃতি । তাহলে আমাদের সমাজ থেকে অন্যায়-অশ্লীলতা দূর হবে এবং সমাজে আমরা সুন্দর ও সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারবো। আল্লাহ আমাদেরকে এই ধরনের সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সংস্কৃতি কি?

সংস্কৃতি হলো একটি জীবনপ্রণালি। মানুষের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও পার্থিব উপকরণের সামগ্রিক রূপকেই সংস্কৃতি বলে। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মান প্রজাতির সাথে সংস্কৃতির প্রত্যয়টি অতি নিবিড়ভাবে জড়িত।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ও সাধনার দ্বারা সংস্কৃতির সৃষ্টি। জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে গঠন করে আর সংস্কৃতি তার হৃদয়কে গঠন করে। মানব সৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টি হলো সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি : সংস্কৃতি হল তাহযীব, তুমুদ্দুন বা ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture। ইংরেজি Culture শব্দটি ল্যাটিন Colere শব্দ থেকে উৎপত্তি। Colere শব্দটির অর্থ কর্ষণ বা চাষ। সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে Culture শব্দটি ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস বেকন ষোল শতকের শেষার্ধে। "সংস্কৃতি" শব্দটি মূলত সংস্কৃত ভাষার শব্দ। আর আরবী প্রতিশব্দ হলো "আস সাকাফাহ।" সাকাফাহ শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা, জানা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া। পরিশীলিত, প্রশিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিকে বলা হয় "মুসাক্কাফ" বা সংস্কৃতিবান। আর সংস্কৃতি শব্দটি গঠিত হয়েছে "সংস্কার" শব্দ থেকে । যার অর্থ শুদ্ধি, পরিমার্জন, মেরামত, ভুল সংশোধন। সুতরাং সংস্কৃতি অর্থ হলো সংস্করণ, বিশুদ্ধকরণ, অনুশীলনলব্ধ দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা :

বিভিন্ন বিজ্ঞানী সংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হলো-

সমাজবিজ্ঞানী ম্যালিনস্কির মতে, সংস্কৃতি মানুষেরই সৃষ্ট যার মাধ্যমে সে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে।

সমাজবিজ্ঞানী জোনস-এর মতে, মানব সৃষ্ট সব কিছুর সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি ।

সমাজবিজ্ঞানী আর. টি শেফার-এর মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজ থেকে অর্জিত এবং সামাজিকভাবে উত্তরসূরিদের মাঝে বর্তায় এমন আচরণসমূহের সামগ্রিক রূপ।

সমাজিবিজ্ঞানী রোজ-এর মতে, সব বস্তু ও অবস্তুর অবস্থার কৌশল হচ্ছে সংস্কৃতি।

ম্যাথি ও আর্নল্ডের-মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে খাঁটি হওয়া, মার্জিত হওয়া।

নৃবিজ্ঞানী ক্রোয়েবার-এর মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে মনোজগতের অংশবিশেষ ।

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, সংস্কৃতি বলতে একটি জাতির আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, কথা বলা, চলাফেরা, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-পরা, ইত্যাদির আবেগিক বা মানসিক অবস্থা।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি, কলাকৌশল ও নিজস্ব সৃজনশীল প্রচেষ্টার দ্বারা এবং বিজ্ঞানের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে যে সুন্দর জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে তার বাহ্যিক প্রতিফলই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা।

দেশ- কাল-পাত্রভেদে সংস্কৃতির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও পার্থিব উপকরণের সামগ্রিক রূপকেই বলা হয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো একটি জীবনপ্রণালি। সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালিই সংস্কৃতি

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

সংস্কৃতি মানুষের ঐতিহ্য বহন করে। জাতিভেদে সংস্কৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। সংস্কৃতি বলতে বুঝায় মানুষের সৃষ্ট প্রতিবেশ আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে ওঠা মানুষের আচার-আচরণ। নিম্নে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১. সংস্কৃতি শিখতে হয় :

সংস্কৃতি আপনা থেকেই গড়ে উঠে না; বংশপরম্পরায় সংস্কৃতি প্রবহমান। সংস্কৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী বংশধরগণের নিকট পৌঁছে। কিন্তু পরবর্তী বংশধরগণ

অভিজ্ঞতা, অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে পূর্ববর্তী সংস্কৃতিকে রপ্ত করে সংস্কৃতিকে শিখতে হয়। জাতিভেদে সংস্কৃতি ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তিকে সংস্কৃতি অনুশীলন করতে হয়।

২. সংস্কৃতি হচ্ছে কাঠামোভিত্তিক :

সংস্কৃতি শূন্যে অবস্থান করে না। সংস্কৃতির একটি কাঠামোভিত্তিক রূপ আছে। সেই রূপের মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। সংস্কৃতির এই রূপটি বস্তুগত বা অবস্তুগত উভয় ধরনেরই হতে পারে।

৩. সংস্কৃতি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত :

সংস্কৃতি বিভিন্ন উপাদান সহযোগে গঠিত হয়। মানবজীবনের বিভিন্ন দিক সংস্কৃতি গঠনে সাহায্য করে। মানুষের জৈবিক চাহিদা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ সংস্কৃতি গঠন করে। বস্তুতপক্ষে এতগুলো উপাদান ছাড়া সংস্কৃতি হতে পারে না।

৪. সংস্কৃতি বিভাজনযোগ্য :

সংস্কৃতি বিভিন্ন অংশ থাকতে পারে। সংস্কৃতি বিভিন্ন উপাদানসহযোগে গঠিত হয়। মানুষের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত সংস্কৃতি সর্বযুগে সর্বস্থানে একই রূপ হয় না। সংস্কৃতি বিভাজনযোগ্য বলেই এরূপ হয়।

৫. সংস্কৃতি পরিবর্তনযোগ্য :

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, রাষ্ট্রের কাজের ব্যাপকতা ও জটিলতা বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন ঘটার জন্য মানুষের আচার-আচরণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবর্তন দেখা যায়। সুতরাং, এগুলোর উপর ভিত্তি করে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে।

৬. সংস্কৃতি বিশ্লেষণযোগ্য :

সংস্কৃতি এক বা একাধিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। সংস্কৃতি নিয়মবহির্ভূত কোন বিষয় নয়। নিয়মানুবর্তী বৈশিষ্ট্যধারী কোন বিষয়কে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করাও তাই সহজ মাধ্যম। সুতরাং, সংস্কৃতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায় একথা অনস্বীকার্য।

৭. সংস্কৃতি সৃষ্টিশীল প্রকাশভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে :

সংস্কৃতি একটি যন্ত্র বা মাধ্যম বিশেষ। এই যন্ত্র বা মাধ্যমের সাহায্যে মানুষ সমাজে তার অবস্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। এর ভিত্তিতে সমাজে তার কতব্য কিরূপ হওয়া উচিত এ বিষয়টি সে নির্ধারণ কররে। তাই বলা যায় যে, সংস্কৃতি দ্বারা ব্যক্তি সামগ্রিক অবস্থা পুনর্বিন্যাস করে সৃষ্টিশীল প্রকাশভঙ্গি অর্জন করে ।

৮. সংস্কৃতি গতিশীল ও সর্বত্র বিরাজমান :

সংস্কৃতি স্থির থাকে না। আবার কোন সমাজই সংস্কৃতির অবস্থানকে অস্বীকার করতে পারে না। সংস্কৃতি অপরিহার্যতার কারণে তা সর্বদাই গতিশীল ও সর্বত্রই বিরাজমান। বংশপরম্পরায় সব দেশে ও সব যুগে সংস্কৃতি তাই গতিশীল ও বিরাজমান।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারা সামাজিক রূপ। একটি জাতির পরিচয় নিহিত থাকে তার সংস্কৃতির মধ্যে বাঙালি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে।

সংস্কৃতি হলো কতগুলো আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা যার মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকি। সংস্কৃতি সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাঙালিদের বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা, ভাষা, মূল্যবোধ, অনুভূতি ইত্যাদির সমষ্টিই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির উপাদান :

সংস্কৃতির উপাদানকে ২ টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. বস্তুগত উপাদান।

২. অবস্তুগত উপাদান।

সংস্কৃতির যে উপাদানটি বাস্তব রূপ ধারণ করে থাকে,তাকে সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান বলা হয়। যেমন : ঘরবাড়ি, কলকারখানা,টেবিল,যন্ত্রপাতি,কাঁচামাল,খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। অপরদিকে সংস্কৃতির যে উপাদানটি উপলব্ধি বা অনুধাবন করা যায়, তাকে অবস্তুগত উপাদান বলা হয়। যেমন : জ্ঞান, বিশ্বাস, নাটক, সাহিত্য, নৃত্যকলা,ভাষা,আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

অপসংস্কৃতি

অপসংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্বভাবের বিপরীত অথবা সাংস্কৃতিক আদর্শের বিরুদ্ধে যা মানুষের সুস্থ ও সুপ্ত প্রতিভাকে বিকৃতি ও বিধবস্ত করে তাই হচ্ছে অপসংস্কৃতি। বর্তমান সমাজে অপসংস্কৃতি বলে থাকে চিহ্নিত করতে পারি তা নিম্নবরূপ:

১. বিদেশি প্রাচুর্য থেকে সৃষ্ট এক ধরনের অশ্লীল নৃত্যগীত, নাটক ও সিনেমা ইত্যাদি।

২. বিদেশি মিডিয়ার কু-প্রভাব।

৩. ডিশ এন্টিনার বদৌলতে প্রাইম, স্টার টিভি, জিটিভি, এমটিভি আগ্রাসন।

৪. যৌন উত্তেজনামূলক সাহিত্য, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, কমিক বই ইত্যাদির মাধ্যমে চরিত্র হরণ করা।

৫. ছায়াছবির মাধ্যমে ভায়োলেন্সের চিত্র প্রদর্শন।

৬. বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ক্লাবের নামে মাদকের ছড়াছড়ি।

৭. পুরুষ ও মহিলাদের বিকৃত রুচির পোশাক পরিধান।

৮. অতি আধুনিকতার নামে বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও অনুশীলন।

১০. বিকৃত রুচি ও যৌন সুড়সুড়িমূলক বিজ্ঞাপন, পোস্টার, ফেস্টুন আলোকচিত্র ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন।

১১. ধর্মের নামে মাজার পূজা, কবর পূজা, শিরক ও বিদাতের ব্যাপক সয়লাব।

সুতরাং অপসংস্কৃতি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে একটি জাতি বা দেশের ঐতিহ্যকে বিবেচনার আয়ত্তে আনতেই হবে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য

প্রথমত, সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করবো।

- বিজ্ঞানী আলফ্রেডের মতে, সংস্কৃতি হলো সমস্ত প্রকার সামাজিক শিল্পকলা, রীতিনীতি, ভাব-ধারা, মূল্যবোধ ও জ্ঞানের সমাহার।

- বিজ্ঞানী ম্যাকাইবারের মতে, আমরা যা, তাই হলো আমাদের সংস্কৃতি। অর্থাৎ, সংস্কৃতি হলো 'সামাজিক আমিত্ব'।

- সংস্কৃতি হলো আত্মপরিচয়।

- সংস্কৃতি হলো রুচিশীলতা, পরিমার্জন, নান্দনিকবোধ।

- সংস্কৃতি হলো সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব।

- সংস্কৃতির অগ্রসরমানের ধারা ধীর।

- সংস্কৃতির ধারক বাহক হলো গ্রাম।

- সংস্কৃতিকে কখনো ধ্বংস করা যায় না। নষ্ট করা যায় না। এটা দুরূহ ব্যাপার। বাঙ্গালীর ভাষা আন্দোলন, রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধকরণ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

- সংস্কৃতি কখনো রূপান্তর ঘটে না।

- সংস্কৃতি হলো সমাজের দর্পন।

- সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় নয়।

- সংস্কৃতি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়।

- সংস্কৃতি হলো আত্মনির্ভরশীল। এটা অন্যের দ্বারা করা বা পাওয়া যায় না। যেমন, কণ্ঠস্বর সবার আলাদা। একজনের গান অন্যজন গাইয়ে দিতে পারে না।

এবার সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

- বিজ্ঞানী আলফ্রেডের মতে, একটি জাতি যখন তার প্রযুক্তিগত কৌশল ও কারিগরী দক্ষতার মাধ্যমে প্রকৃতিকে বশে নিয়ে আসে তখনই সভ্যতার সৃষ্টি হয়।

- বিজ্ঞানী ম্যাকাইবারের মতে, আমরা যা ব্যবহার করি, তাই আমাদের সভ্যতা। অর্থাৎ সামাজিক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ।

- সভ্যতার ধারক ও বাহক হলো শহর।

- সভ্যতা হলো সদা অগ্রসরমান।

- সভ্যতা হলো বাহ্যিক চাকচিক্য।

- সভ্যতা হলো সংস্কৃতির প্রস্ফুটিত রূপ।

- সভ্যতা হলো বস্তুগত সৃষ্টি।

- সভ্যতা এক জাতি হতে আরেক জাতিতে রূপান্তর ঘটে।

- সভ্যতাকে ধ্বংস করা যায়।

- সভ্যতা হলো সংস্কৃতির প্রতিফলন।

- সভ্যতা বিচার্য বিষয়।

- সভ্যতা দৃষ্টিগ্রাহ্য।

- সভ্যতা সৃষ্টিগত পরিচয়।

ইসলামী সংস্কৃতির বিবর্তন ও রূপরেখা

ইসলামী সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়ে বর্তমানের ব্যাপক পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে মূলত: ইসলামের চার দলীলের ভিত্তিতে- কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাহ্, এজমা' ও ক্বিয়াস। ক্বোরআনুল করীম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম মারফত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রেরিত আল্লাহর বাণী বা 'ওহী'। 'সুন্নাহ্' বলতে বুঝাচ্ছি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম, বাণী ও অনুমোদন, যেগুলো খোদ্ রসূলের পাকের জন্য খাস নয়; উম্মতের আমল করার জন্য প্রযোজ্য।

এগুলো ছাড়াও খোলাফা-ই রাশেদীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত শেরে খোদা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সুন্নাতসমূহও 'সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত। ক্বোরআন- সুন্নাহ্ মূলত আল্লাহরই পক্ষ হতে এসেছে। এ দু'টি ইসলামি সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি। এ দুই ভিত্তি'র আলোকেই ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত হলো এজমা'। ক্বোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'র অনুসরণে ক্বিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত পরিবেশ, সমস্যা ও পরিস্থিতির আলোকে গবেষণা করে ক্বিয়াস বা অনুমান ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠবে। এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি বির্নিমাণের অবারিত ধারা চলতে থাকবে, যা কখনো শেষ হবে না। উল্লেখ্য, বর্ণিত উৎসগুলো শেষ নবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকে ধরা হয়। তাছাড়া, সংস্কৃতির ধারা, প্রথম নবী হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম পুরুষ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং প্রথম নারী হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম'র জীবনাচার'র বিবর্তন' ও আজকের সংস্কৃতির আদিতম উৎস, যা তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে এবং তাদের মধ্যে সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হয়ে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত সেই রূপরেখা অনুসরণ করেই সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ মানব সমাজের স্রোতে ভেসে কালের শেষ সীমানা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। যদিও এ সাংস্কৃতিক ধারা আদম-হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম'র

মাধ্যমেই সর্বপ্রথম এ দুনিয়ায় প্রবেশ করে, পক্ষান্তরে একটি প্রশ্ন থেকে যায় 'অপসংস্কৃতি' সম্পর্কে। অপসংস্কৃতির উৎস ও বিকাশ কিভাবে হলো- এ প্রশ্নটিকে আমরা সূত্রবদ্ধ করে দেখাতে চাই। আর এর সহজ উত্তর হলো এই যে, এ অপসংস্কৃতির উৎস এর বিকাশ মানুষের আদি শত্রু ইবলীসের মাধ্যমে। আল্লাহর বিধান ও নির্দেশের প্রতি বিনা প্রশ্নে অনুগত হওয়ার ফেরেশতা সূলভ আচরণ এবং এর বিপরীতে আনুগত্য প্রত্যাখ্যানকারী অহংকারী শয়তানী আচরণ এ উভয় বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীতে বিকশিত হয় এ পৃথিবীতে। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণ তথা আল্লাহর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এ ফেরেশতা মনোভাবের বিকাশ ঘটতে থাকে, যাঁর নামই সংস্কৃতি বা ইসলামী সংস্কৃতি। আর পরবর্তীতে ইবলিস শয়তানের প্ররোচণায় স্রষ্টা বিস্মৃত পথভ্রষ্ট মানব সমাজের মাধ্যমে প্রসারিত বিশ্বাস ও আচার-আচরণই হলো অপসংস্কৃতি।

সুতরাং সংস্কৃতি নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে আসা এক মহান নি'মাত যা দুনিয়াকে জান্নাতের মরূদ্যানে পরিণত করতে পারে। আর পক্ষান্তরে, অপসংস্কৃতি হলো শয়তানী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ যা সৃষ্টির সেরা মানুষকে নিকৃষ্ট জীব-জানোয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে দুনিয়াতে অশান্তি ও আখিরাতে কষ্টদায়ক ভয়াবহ্ নরক যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত করে। মানুষ নবীগণের শিক্ষায় সংস্কৃতিবান হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর শয়তানী প্ররোচনায় নিজের মনগড়া বিশ্বাস ও আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বিতারিত ইবলিসের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কারণে আল্লাহর গজব ডেকে আনে। উল্লেখ থাকে যে, সেদিন আদম আলায়হিস্ সালামকে সম্মান না করার অপরাধে বিতাড়িত ইবলিস, তার হাজার হাজার বছরের ইবাদতের বদলা হিসেবে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে এমন একটি ক্ষমতা অর্জন করেছিল, যেন সে মানুষের একটি বিশাল অংশকেও প্ররোচনা দিয়ে তার সঙ্গী হিসেবে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। তার এই শক্তির মহড়া সেদিন থেকে শুরু হয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

এভাবে সৃষ্টির শুরু থেকে একদল নবীগণের আদর্শে সংস্কৃতিবান হয়ে জান্নাতের দিকে আর অপরদল শয়তানের অপসংস্কৃতিতে মগ্ন হয়ে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। আল্লাহর খলীফাগণ সত্যের দিকে আর শয়তান তার বিপরীতে নেতৃত্ব দিয়ে পৃথিবীর ধাবিত করবে। মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে, শয়তানের প্ররোচনায় নিজের ভালো-মন্দের বিধান নিজেরা তৈরী করে পৃথিবীতে অশান্তি-হানাহানি বাড়িয়ে দেয়, ঠিক তখনি আল্লাহ্ পাক তাঁর সে বান্দাদের ফিরিয়ে আনতে পাঠিয়ে দেন উক্ত অঞ্চলের মানুষের একই ভাষাভাষি কোন নবী রাসূল আলায়হিমুস্ সালামকে। এভাবে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত তিন লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার পর্যন্ত খলীফা প্রেরণের কথা আমরা জেনে আসছি। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কোনো নবী প্রেরণ করবেন না, সেহেতু তাঁর হাতেই দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা করা হয়; যাতে করে মানুষ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামের সংস্কৃতি অতিক্রম করার কোনো প্রয়োজন না হয়।

ইসলামী সংস্কৃতি মহান আল্লাহর তাওহীদ ভিত্তিক সংস্কৃতি অর্থাৎ যে সংস্কৃতিতে আল্লাহর সাথে র্শিকের কোন ছোঁয়া থাকবেনা। ইসলামী সংস্কৃতির মূলনীতি ও মূল্যবোধ বিশুদ্ধ, যথার্থ, মহান ও সার্বজনীন। অর্থাৎ এটি এমন এক সংস্কৃতি যার মূলনীতি এতই বিশুদ্ধ যাতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

ইসলাম অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে খুব কম জিনিসই গ্রহণ করেছে। এমন কি বলা যেতে পারে যে, এরও বেশীরভাগ ইসলামেরই নিজস্ব জিনিস। অবশ্য মুসলমানরা অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে বর্ণ, বৈচিত্র, কারুকার্য এবং শোভাসৌন্দর্যের উপকরন নিয়ে এদিককার সমৃদ্ধি কিছুটা বাড়িয়েছে। আর এটাই দর্শকদের চোখে এতখানি প্রকট হয়ে ওঠেছে যে, গোটা ইমারতের ওপরই তারা অনুকরণের অপবাদ চাপিয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছে।

প্রাক-ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি

প্রাক-ইসলামী যুগ বলতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন'র আগের সময়কে বুঝানো হয়। এ সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়াতও বলা হয়। এ সময়ের নবী ছিলেন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের পাঁচশত বছর পরের এ সময় (৫১০-৬১০ খ্রিস্টাব্দ) সাধারণত: আইয়্যামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারের যুগ' হিসেবে পরিচিত। (P.k. Hitti, History of the Arabs)

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পর তাঁর উম্মতগণ খোদায়ী বিধান ছেড়ে ধীরে ধীরে আবারো শয়তানের তাঁবেদার বনে যায়। তারা আল্লাহর কিতাব পবিত্র ইঞ্জীলকেও নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধানুযায়ী পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলে। এভাবে পাঁচশ' বছরের এ সময়ে ঈসায়ী ধর্মের আর কোনো অক্ষত-অবিকৃত নিদর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া না যাওয়ায় ধর্মের নামে পৌত্তলিকতা এবং হিংসা ও হানাহানি এ ভয়াবহ রূপ লাভ করে। পরিশ্রুত মানবিক জীবন-যাপনের খোদায়ী বিধানের অবর্তমানে মানুষ নানা ধরনের অপসংস্কৃতি ও পাপাচারে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। জ্ঞান সাধনা, তথ্য অনুসন্ধান, সুস্থ বিনোদন, পরিবার ও সমাজব্যবস্থা সবকিছুই নির্বাসিত হয়েছিল দুনিয়া থেকে। সে যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপীয়দের কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থপাঠ করাকেও সহ্য করা হতোনা। শিক্ষিত লোক এবং পাঠাগার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ঔ.ড. J.W. Draper তাঁর intellectual Development in Europe গ্রন্থে বলেন, "খ্রীষ্ট ধর্মের যুগে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। পৃথিবীকে গোলাকার বলা ছিল অপরাধ। ঠিক সেই যুগের অজ্ঞতার কারণেই হিপাশিয়ার ঐ ক্রুশবিদ্ধ দেহকে তাঁহার জ্ঞান পিপাসার জন্য আলোকজান্দ্রিয়ার গীর্জায় খন্ড-বিখন্ড করা হইয়াছিল। গ্যালিলিওকে রোমের গীর্জায় আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল। কোন লোকই নিজের সম্পদ, জীবন বা দেহের নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া প্রচলিত মতবাদের উপর সন্দেহ পোষণ করিতে পারিতনা। ফলে কোথাও কোন আইন প্রণেতা, দার্শনিক ও কবির

আবির্ভাব ঘটে নাই।" [কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ.-২০৭]

বাইবেলের বিকৃতরূপ তুলে ধরে গীর্জা ভিত্তিক স্বার্থান্বেষী পুরোহিতরা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সেদিন সংস্কৃতির বিকাশের সকল দরজা শক্তহাতে বন্ধ করে রেখেছিল। সেদিনকার ইউরোপের অন্ধকার যুগ সম্পর্কে রয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক দলিল। অধ্যাপক কে. আলী তাঁর 'মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস' গ্রন্থে অপর এক ঐতিহাসিকের সূত্রে বলেন, "মহান গ্রেগরি রোম হইতে সকল শিক্ষিত লোককে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে অগাষ্টাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত দর্শন শাস্ত্রের পাঠাগারে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার কুশাসনে গ্রীক ও রোমান গ্রন্থ পাঠ ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।" লেক্ বলেন, সপ্তম শতাব্দিতে ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ইউরোপে জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সুপ্তাবস্থায় ছিল। পুরোহিতদের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নানা কুসংস্কার গড়িয়া তুলিয়াছিল। এইভাবে মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" [সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮] ঐতিহাসিকদের মতে, সে যুগে তুলনামূলকভাবে আরবের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য-জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপের চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল আরবরা। আরবদের উন্নত ভাষা সম্পর্কে পি.কে. হিট্টি HISTORY OF ARABS গ্রন্থে বলেন, "এই ভাষাই (আরবী) মধ্যযুগে বহু শতাব্দি ধরিয়া সভ্য বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতি চেতনার বাহন ছিল।" তিনি বলেন, "পৃথিবীতে সম্ভবত, অন্য কোনো জাতি আরবদের ন্যায় সাহিত্য চর্চায় এতবেশী স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ প্রকাশ করে নাই এবং কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা এত আবেগাচ্ছন্ন হয়নাই।" হযরত জালালুদ্দিন সুয়ূত্বী তাঁর 'আল-মুযহির' ২য় খন্ডে বলেন, "কবিতা আরবদের সার্বজনীন পরিচয়ের স্বাক্ষরিত দলিল।"

জ.অ. R.A. Nicholson তাঁর A Literary History of the Arbs গ্রন্থে আরবদের কবিতা প্রীতি সম্পর্কে বলেন, 'সেই যুগে কবিতা কিছু সংখ্যক সংস্কৃতিমনা লোকের

বিলাসিতার বস্তু ছিল না, বরং ইহা ছিল তাহাদের সাহিত্য প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।' [সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯, ২১০] প্রাক-

উল্লেখ্য, যখন ইউরোপে গীর্জার বাইরে জ্ঞানার্জনের রাস্তা বন্ধ রাখা হয়েছিল, সে সময়েও আরবের শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত ক্বোরাঈশ বংশে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে আবী তালিব, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতো শিক্ষিত পুরুষ এবং হযরত হাফসা ও উম্মে কুলসূম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার মতো শিক্ষিত নারী'র মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা ছিল। আর এ সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের পরবর্তী সময়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিধি-বিধান তথা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে লিপিবদ্ধ করণের কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতির কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের চেয়ে আরব'রা এগিয়ে থাকলেও সামগ্রিকভাবে সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। রাজনৈতিকভাবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন না থাকায় গোত্র ভিত্তিক শাসনের এ যুগে গোত্রে-গোত্রে শত্রুতা ছিল বংশ পরম্পরায়। এক গোত্রের বিরুদ্ধে অপর গোত্রের প্রতিশোধ স্পৃহা এবং এর পরিণামে সমগ্র আরব বিশেষত: নজদ ও হিজায ছিল রক্তারক্তি ও হানাহানির এক নিয়মিত ময়দান। বহুধা বিভক্ত এ আরব সমাজে আইনের শাসনের পরিবর্তে 'জোর যার মুল্লুক তার' বিধানই প্রচলিত ছিল সর্বত্র।

সামাজিকভাবে নানা প্রকারের কুসংস্কার সমগ্র আরবকে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। দেব-দেবীর সন্তুষ্টি পেতে বেদীমূলে নরবলি ছিল সে সমাজের স্বাভাবিক সংস্কৃতি। নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা সে যুগে আরব বা অন্য কোথাও কল্পনা করা যেত না। বহুপত্নী ও বহুপতি প্রথা আরবের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে পশুর মতো ব্যবহার করা হতো। সুদ, মদ, জুয়া, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যাসহ অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত ছিল মানুষ। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে অপমানের চোখে দেখা হতো সামাজিকভাবে। তাই জন্মদাতা পিতা স্বহস্তে জীবিত কবর দিতো নিজের শিশু কন্যাকে। বিধবা বিয়ে ও সম্পত্তিতে নারীর অংশ কল্পনা করা যেত না।

অধিকন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে তারা বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাথর, বৃক্ষ ও মূর্তির পূজাতে লিপ্ত ছিল। ড.W.Muir Zuvi Life of Muhammad গ্রন্থে বলেন, 'স্বরণাতীত কাল হইতে মক্কা ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ আধ্যাত্মিক আসারতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল-মূর্তি পূজাই ছিল তাহাদের ধর্ম'। [প্রাগুক্ত, পৃ. ৪]

কা'বা ঘরে 'হুবল'সহ ছোট বড় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে তাদের পূজা করত এবং বলত যে, ''আমরা কেবল ইহাদের পূজা এই জন্যই করিতেছি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিবে'। [আল-কোরআন: ৩৯ঃ৩]

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে অপর আয়াতে বলা হয় যে, ''বেদুইন আরবদের মধ্যে কুফর ও মুনাফেক্বী বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।'' [আয়াত ৯ঃ৯৮] মোটকথা, 'হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) চুম্বন এবং খানায়ে কা'বার তাওয়াফের মতো কিছু মৌলিক সংস্কৃতির অনুসরণের পাশাপাশি তাদের মধ্যে ছিল অসংখ্য অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা। সে সময়ে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুসহ কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য পাপাচার মুক্ত সহজ-সরল জীবন-যাপন করলেও অধিকাংশরা ছিলো শির্ক ও অন্যান্য গর্হিত কাজে অভ্যস্ত। ঠিক এমন সময়েই ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে ইসলামের সূচনা।

ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা

কোরআন, সুন্নাহ, এজমা' ও কিয়াস'ই ইসলামি সংস্কৃতির উৎস। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হলো- ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। এগুলোকে আমরা ইসলামের মৌলিক এবং বাধ্যতামূলক সাংস্কৃতিক উপাদান বলতে পারি। সঠিক বিশ্বাস বা আক্বিদার উপরই ঈমানের বাস্তবতা নির্ভর করে। ঈমান হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাসমূহ, কিতাবসমূহ (পূর্ববর্তী এবং বর্তমান), নবীগণ (পূর্ববর্তীসহ) পরকাল সম্পর্কে, তাক্বদীর তথা অদৃষ্টের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে সঠিক

আক্বিদা (যথাযথ বিশ্বাস) প্রতিষ্ঠা। উপরোক্ত সপ্ত বিষয়ের যে কোনটিতে ব্যতিক্রম আক্বীদা পোষণকারী'র ঈমানের অস্তিত্ব প্রশ্নে সংশয় সৃষ্টি হয়। নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত শুধুমাত্র ঈমানদারের জন্যই নির্ধারিত। নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি পূর্ববর্তী নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর সময়েও পালিত হতো, তবে বর্তমানের মতো এতো সমৃদ্ধ ও সুসংহত ছিল না।

নামায মুসলমানদের প্রধান সংস্কৃতি। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের একজন নামাজিকে দেখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বুঝে নিতে পারে যে উনি মুসলিম। দৈনিক পাঁচওয়াক্ত শুক্রবারে জুমা এবং ঈদ-জানাযা ইত্যাদি নামাযের মাধ্যমে বিশষত জামাতসহ আদায়ের রীতি মুসলমানদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে সুসংহত করেছে। মুসলমানদের এ সংস্কৃতি পালনের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তি হলেও তা শারীরিক সুস্থতার জন্য হালকা যোগ ব্যায়ামের কাজও করে। এখানেই ইসলামী সংস্কৃতির সার্থকতা।

রোযা পালনের মাধ্যমেও শারীরিক সুস্থতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান খালিপেটে থাকার একটি নিয়মিত ব্যবস্থাকে শারীরিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য মনে করছে। তাছাড়া 'কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, জীবনে যাদের হররোজ রোজা-ক্ষুধায় আসেনা নীদ' এমন অভাবী-অনাহারী প্রতিবেশির ব্যথা অনুধাবনের একটা ব্যবস্থাও এই রোযা। আবার ইফতার পার্টি তো আজকাল সার্বজনীন উৎসবে পরিনত হচ্ছে। সুতরাং রোযা সাংস্কৃতি আমাদের সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার।

হজ্ব' বিশ্ব ইসলামী সংস্কৃতির একটি রূপ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এ উপলক্ষে মক্কায়ে মুয়ায্যামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় সমবেত হয়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে কতিপয় নির্ধারিত কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই একই আওয়াজে গেয়ে যাচ্ছে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শরিকা লাকা লাব্বাইক... খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করছে, চুমু খাচ্ছে হাযরে আসওয়াদে। সাফা-মারওয়া সা'ঈ (দৌঁড়াদৌঁড়ি) করছে। ৯ যিলহজ্ব আরাফাতের ময়দানে বক্তব্য শুনে নামায পড়ছে দুই ওয়াক্তকে একত্র করে। রাত যাপন করছে মুযদালিফা নামক পাহাড়ে এবং মাগরিব-

এশা একত্রে আদায় করছে। আবার লক্ষ লক্ষ হাজী ফিরে আসছে মিনার তাঁবুতে। সেখানে শয়তানের কল্পিত প্রতিকৃতিতে তিনদিন পর্যন্ত পাথর ছুঁড়ে মারছে। কোরবানী দিচ্ছে। মাথা মুন্ডাচ্ছে। কি এক অপরূপ দৃশ্য। এ সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বের নানা রঙের নানা জাতের নানা মাযহাবের মুসলমানদেরকে এক কাতারে শামিল করে বিশ্বের সকল ঈমানদার ভাই-ভাই এ মূল্যবোধের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

যাকাত ইসলামি অর্থনীতি উন্নয়নের এক গতিশীল ব্যবস্থা। ধনীদের পুঞ্জীভূত অতিরিক্ত ধন-সম্পদ, টাকা পয়সা প্রতি বছরে একবার অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়ার এ সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্য কোন বিধানে বিরল। ধনী-গরীবের ব্যবধান কমিয়ে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার এ অঙ্গীকার শুধু ইসলামী সংস্কৃতিতেই রয়েছে। এখানে সংস্কৃতি পালনের উদ্দেশ্য একই সাথে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। এখানেই অন্যান্যদের সাথে ইসলামের পার্থক্য।

উপরোক্ত ফরয সংস্কৃতির বাইরে রয়েছে অসংখ্য ওয়াজিব সুন্নাত, নফল মুবাহ ধরনের সংস্কৃতি। যা একজন সাধারণ ঈমানদারকে পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে কবরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে ভয় করা উচিত এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা। [সূরা আল-ই ইমরান]

ইসলামী সংস্কৃতি কি?

ইসলামী সংস্কৃতি মহান আল্লাহর তাওহীদ ভিত্তিক সংস্কৃতি অর্থাৎ যে সংস্কৃতিতে আল্লাহর সাথে শির্কের কোন ছোঁয়া থাকবেনা। ইসলামী সংস্কৃতির মূলনীতি ও মূল্যবোধ বিশুদ্ধ, যথার্থ, মহান ও সার্বজনীন। অর্থাৎ এটি এমন এক সংস্কৃতি যার মূলনীতি এতই বিশুদ্ধ যাতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামি শরিয়ার আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের জীবনের সব কর্মকাণ্ডই ইসলামি সংস্কৃতির আওতাভুক্ত, যা মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (সা.)-এর

পদাঙ্ক অনুসরণে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ইসলামি চিন্তা-ঐতিহ্য, ইসলামি সংস্কৃতিকে যেভাবে উপস্থাপন করে, সে ভিত্তিতে তার সংজ্ঞা দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

১. কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত জীবনাচার। জীবনযাপন, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণের ইসলাম নির্দেশিত প্রতিফলনই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি।

২. যে আচার, ক্রিয়া, রুচি ও চেতনা জীবনকে সুন্দর করে, সুষমামণ্ডিত করে, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে, ইসলামের মূল্যবোধলগ্ন, সেসব আচারের প্রতিফলন হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। এর মূলে আছে আল কোরআন ও মহানবীর জীবনে তার বাস্তবায়িত রূপ। শান্তি, সুখ, স্বাধীনতা ও সর্বজনীন কল্যাণই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

৩. ইসলামি সংস্কৃতি প্রধানত উন্নততর ভাবধারার সেই মানকে নির্দেশ করে, যা মহানবী (সা.) প্রবর্তিত ইসলামি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর আওতায় আসে সেই সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান, যার ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা নিহিত সেই আদর্শে, সেই শিক্ষায়। মুসলিমদের অনুশীলিত জীবনপ্রক্রিয়া, ধর্মাচার, সামাজিক নিয়ম ও ঐতিহ্যের যা কিছু ইসলামের নির্দেশনা ও অনুমোদন পায়, সেগুলোর সুকৃত ও প্রতিফলিত রূপ হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতির উপাদান

১.জ্ঞানগত উপাদান : ইসলামি সংস্কৃতির জ্ঞানগত মৌলিক উপাদান হচ্ছে আল্লাহ প্রেরিত আসমানি কিতাবসমূহ, কুরআন এবং হাদিস। মানবজীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবনপদ্ধতি যুগে যুগে আসমানি কিতাব আল্লাহ তাঁর প্রেরিত বিশেষ দূত নবী রাসুলের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। ইসলামের প্রথম আদেশ ও বিধান ‘ইকরা’, অর্থাৎ ‘পড়ো’। মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসুলের ওপর অবতীর্ণ প্রথম অহি জ্ঞানচর্চার আদেশ। তাই মুসলিম মাত্রই পাঠক হবে, জ্ঞানচর্চা করবে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে তার সাংস্কৃতিক পরিচয়।

২.বিশ্বাস : আরবিতে বলা হয় 'ঈমান'। এটি ইসলামি সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইসলামি জীবনধারায় ব্যক্তির ঈমান-আকিদা (বিশ্বাস) পরিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঈমান বা বিশ্বাসের বলেই সে মানুষের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদারদৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, আনুগত্য, আইনানুবর্তিতা, ইত্যকার উৎকৃষ্ট গুণরাজি সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচণ্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে। যার ঈমান ও বিশ্বাস যত সুদৃঢ়, তার সংস্কৃতি মানস তত বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর।

৩.আদর্শ ও মূল্যবোধ : বিশেষ কোনো অবস্থায় মানুষ কীভাবে কাজ করে, চিন্তা বা অনুভব করে সে সম্পর্কিত সমাজের যে আকাঙ্ক্ষা তারই নাম আদর্শ। সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের কাজ, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধে গড়ে ওঠে। প্রতিটি সমাজ ও সংস্কৃতির নিজস্ব আদর্শ ও মূল্যবোধ রয়েছে। এসব আদর্শ ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে সমাজজীবনে দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করার মানবীয় অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে।

৪.ভাষা : প্রত্যেক সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। জাতি-বর্ণ, শ্রেণিভেদে ভাষা সবাইকে একীভূত করে। ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃতি প্রস্ফুটিত হয়। ভাষা হচ্ছে সমাজ কাঠামোর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক। বস্তুত ভাষা হচ্ছে সবার অস্তিত্বের ভিত্তি স্বরূপ এবং চেতনার বাহন স্বরূপ। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ সাংস্কৃতিক শিক্ষা অর্জন করে এবং সমাজজীবনে এর প্রতিফলন ঘটায়। মুসলমান যে দেশে যে ভাষায় কথা বলুক, তার প্রকাশভঙ্গি হবে সুন্দর। তার ভাষার মাধ্যমেই বোঝা যাবে, সে মুসলিম। মুসলমানের কথাবার্তা, উচ্চারণ ইত্যাদি কেমন হবে, তার বিশদ বিবরণ রয়েছে কুরআন-হাদিসে।

৫.সমাজব্যবস্থা : ইসলামি সংস্কৃতি সমাজের ব্যক্তিদের মাঝে এমন শৃঙ্খলা গড়ে তোলে, যাতে ব্যক্তির চরিত্র ও সমাজব্যবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত ভারসাম্যপূর্ণ গুণাবলির প্রতিফলন ঘটে। পৃথিবীর কোনো মানুষ সমাজ এড়িয়ে চলতে পারে না। পারস্পরিক সাক্ষাৎ-সহযোগিতা ও লেনদেন থাকলে মানুষের জীবন সুন্দর হয়। মানুষের মাঝে নানা গোষ্ঠী

ও সমাজ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের অনেক জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞাত ও সর্ব বিষয়ে অবগত' (সুরা হুজুরাত : ১৩)। এ আয়াত থেকে এটাও বুঝে আসে, বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষের সমাজে সেই উত্তম যে তাকওয়া অবলম্বন করবে। আর এটা ইসলামি সাংস্কৃতিরই অপূর্ব প্রকাশ।

ইসলামি সংস্কৃতির গুরুত্ব এবং কতিপয় বৈশিষ্ট্য

কোরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত নীতি ও আচরণের অনুসরণের নামই যখন ইসলামি সংস্কৃতি, তখন কোনো মুসলমানের পক্ষেই ইসলামি সংস্কৃতির প্রশ্নে সংশয়প্রবণ হওয়ার সুযোগ নেই। এর অনুসরণ, ধারণ, বিস্তার ও জীবনে এর পূর্ণতা বিধানের প্রশ্নে ইতস্ততাবোধের সুযোগ নেই। অতএব, যেখানেই মুসলিম জীবন আছে, সেখানেই ইসলামি সংস্কৃতি থাকবে। মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ সংস্কৃতি প্রাসঙ্গিক, আবেদনপূর্ণ, যার গুরুত্ব অনেক প্রবল, গভীর, বিরাট।

১. বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা

ইসলামি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা। আল্লাহতায়ালা নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। পবিত্রতা বলতে বাহ্যিক বা দৈহিক এবং অন্তরের বা মনের উভয় প্রকার পবিত্রতা বোঝায়। ইসলাম উভয় ধরনের পবিত্রতার ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। ইবাদতের জন্য যেমন পবিত্রতা দরকার, তেমনি থাকাণ্ডখাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবিকা অর্জন, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতার ওপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ইসলামি সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মন ও মননশীলতা সৃষ্টি করে, তা সব ধরনের কলুষতা, আবিলতা, পংকিলতা, সংকীর্ণতা, হঠকারিতা, কপটতা, ধোঁকা, প্রতারণা,

বকধার্মিকতা, অশ্লীলতা, উলঙ্গতা, নির্লজ্জতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পাষ-তা, অমানবিকতা, জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, অসুন্দর, বেমানান, বেআদবি, পাপাচার ও নোংরামি থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র হবার জন্য তাড়িত করে। এর অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা দেয়। এর অনুকূল আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে।

২. কুসংস্কারমুক্ত

সব ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুসংস্কার একটি সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজের অধঃপতন ঘটায়; সমাজের মধ্যে অশান্তি ও অমঙ্গল টেনে আনে; এর কারণে সামাজিক অবক্ষয় ঘটে। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। কুসংস্কার অর্থ ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা বা ধর্মের বিষয়ে দলিলহীন ও যুক্তিহীন বিশ্বাস, অশুদ্ধ, অমার্জিত বা দূষণীয় কাজ। এখানে কুসংস্কার বলতে সেসব কৃষ্টি, আচরণ, অভ্যাস, প্রথা, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে সিদ্ধ, সভ্যতা, পুণ্য ও ধর্মের অংশ মনে করা হয়, অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে তা সভ্যতা ও দ্বীনের আওতায় পড়ে না।

বস্তুত সেগুলো ইসলামি রীতিনীতি ও সভ্যতার পরিপন্থি বলেই বিবেচিত। হাদিসে এ জাতীয় বিষয়কেই মুহদাসাতুল উমুর (নব আবিষ্কৃত বিষয়াদি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোর ওপর আমল করা গোমরাহি, যা ব্যক্তিকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। রাসুল (সা.) সমগ্র উম্মতকে সব ধরনের কুসংস্কার ও বিদাতকে পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর ও সাহাবিদের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এতেই রয়েছে চিরকল্যাণ ও শান্তি। মূলত সুষ্ঠু ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে কুসংস্কারের মূলোৎপাটন আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব হলো কুসংস্কার বা বিদাতকে কোনোরূপ প্রশ্রয় না দেয়া।

৩. মানবতাবোধ

ইসলামি সংস্কৃতির আরেক অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো মানবতাবোধ। মুমিনের জীবনবোধ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ। মানবতাবোধ মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ; বরং এটিই মানুষের শ্রেষ্ঠতম

মানবিক গুণ। মানবতাবোধ হলো, মানুষের জন্য অনুভূতি, মানবিক চেতনা, মানুষের কল্যাণ কামনা, মানুষের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হওয়া এবং মানুষের সুখ-শান্তিতে আনন্দিত হওয়া। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, মানুষ মানুষের উপকারে তৎপর হয়, মানব কল্যাণে ব্রতী হয়। মানুষের উন্নতি ও সর্বাঙ্গীণ সুখ-শান্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের প্রতি সুবিচার করে, মানুষ মানুষের অধিকার দিয়ে দেয়, অধিকার সংরক্ষণ করে। মানুষের অধিকার লুণ্ঠিত হলে, মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন হলে অপর মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এরই নির্দেশে দয়া ও অনুকম্পার অভ্যাসকে সামাজিক বাস্তবতায় পরিণত করে ইসলামি সংস্কৃতি। ন্যায়, ইনসাফ, কল্যাণ, ত্যাগ ও অন্যের দুঃখমোচনের প্রয়াস ইসলামি সংস্কৃতির অবধারিত অংশ।

সাংস্কৃতিক এই বোধ ও বাস্তবতার অভাবেই মানুষ মানুষের অধিকার হরণ করে, মানুষ মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়, মানুষ মানুষকে কষ্ট দেয়, মানুষের দুঃখ-কষ্টে মানুষ ব্যথিত হয় না, মানব-কল্যাণে এগিয়ে আসে না, মানব সেবায় ব্রতী হয় না। এরকম মানুষ মানবীয় চেতনাবোধহীন। মূলত এটিই হলো জড়বাদী খোদাহীন সংস্কৃতির আত্মকেন্দ্রিকতার অভিশাপ।

৪. সৌন্দর্যবোধ

ইসলাম দিয়েছে এক অনুপম আদর্শ সংস্কৃতি। তাওহিদি ঈমান এর উজ্জীবনী শক্তি। আত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতা এর প্রাণ। ইসলামি সংস্কৃতির এই অন্তর্গত সৌন্দর্যই তার ব্যবহারিক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রবর্তক। পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের পর শিল্প-কারখানা এবং শিল্পকলা সব জায়গায় মানবিক মূল্যবোধ উপেক্ষিত হয়েছে। সব ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দর্শন তাদের জীবনব্যবস্থাকে গ্রাস করে দিয়েছে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো অস্কার ওয়াইল্ডের ঘোষণা Art for art sake. কিন্তু ইসলামি জীবনদর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামি দর্শনে এক মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সে প্রতি মুহূর্তে সচেতন ও সক্রিয়। তার জীবনের একটি মুহূর্তও লক্ষ্য বিবর্জিত থাকে না। ক্ষুদ্র থেকে বড় কোনো কাজই তার লক্ষচ্যুত নয়। জীবনের সব বিষয়ের মতো শিল্পকলার

ক্ষেত্রেও সে লক্ষ্যহীন নয়। আদর্শচ্যুত নয়। মানবকল্যাণ, মানবতাবোধ এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের তীব্র অনুভূতিতে সে সদা সক্রিয়। মুমিনের সব কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রতিবিম্বিত। সর্বত্রই সে তার মহামনিবের ইচ্ছা কার্যকর করে। সর্ব সময় সে আল্লাহমুখী থাকে। রাসুলের আদর্শ থেকে সে কখনও বিচ্যুত হয় না। আখেরাতের মুক্তিচেতনা কখনও তার বিবেককে শিথিল করে না। ফলে Art for art sake নয়, ইসলামের কাছে আর্ট হলো মানব ও সামাজের কল্যাণের হাতিয়ার। কিন্তু একই সঙ্গে তা শিল্পরুচি ও আর্টের ঋদ্ধিতে নিরাপোশ। ফলে শিল্প ও সমাজ ইসলামি সংস্কৃতিতে সমান্তরাল। এখানে আর্টের মূলনীতির উৎস হয় রাসুলের আদর্শ। মুমিনের সব আর্ট বা শিল্প যেভাবে শৈল্পিক সুন্দরতায় হবে অনিন্দ্য, তেমনি হবে আদর্শভিত্তিক এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক।

৫. উদারতা, জ্ঞানালোক ও গতিশীল জীবনচেতনা

ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি এক স্বচ্ছ, উদার ও গতিশীল জীবনচেতনার প্রাণবন্ত বহিঃপ্রকাশ। ইসলামি সংস্কৃতি এমন একটি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত, যার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহভীতিপূর্ণ সদাচার। ইসলামে বর্ণ, পেশা, পদ, রক্ত, গোত্র, সম্পদ ইত্যাদির দ্বারা সামাজিক বা মানবিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় না, তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই সেখানে মর্যাদার মাপকাঠি। কোরআন ও হাদিসের বহু স্থানে এই কথার প্রতিধ্বনি হয়েছে বারবার। বিদায় হজের ঐতিহাসিক বাণীতে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'হে মানুষ সকল, জেনে রেখ! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। অতএব, কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং কোনো আরবের ওপর অনারবের প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কালো বর্ণের ওপরে সাদা বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সাদা বর্ণের ওপর কালো বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয় শুধু তাকওয়ার মাধ্যমে।' (মুসনাদে আহমদ : ২২৩৯৯)।

কোনো অঞ্চলিক, জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়; ইসলামি সংস্কৃতি; বরং তা হচ্ছে বৃহত্তর মানবীয় সংস্কৃতি। তাওহিদের বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত এক মোমিন রিসালাতের বিশ্বাস ও অনুবর্তিতায় আখেরাতের বোধে হন বলিষ্ঠ। তিনি যে কালে, যে দেশে, যে

সমাজে থাকুন, ইসলামি সংস্কৃতি তাকে আপন মাতৃক্রোড়ে দুগ্ধদান করবে। তিনি যে বর্ণের হোন, যে গোত্রের হোন, যে ভূখণ্ডের হোন। ইসলামি সংস্কৃতির সর্বজনীনতা গোটা বিশ্বের প্রতিটি মানবগোষ্ঠীকে নিজের পরিসরে জায়গা দেয়, জায়গা দিতে প্রস্তুত।

এ সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞানশীলতা। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান ও গবেষণাকে এ সংস্কৃতি কত গভীরভাবে, কত ব্যাপকভাবে এবং কত তীব্রভাবে প্রণোদিত করে, তার সাক্ষ্য কোরআন-সুন্নাহ থেকে নিয়ে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগে ব্যাপক ও বিস্তর। এ সংস্কৃতিতে নৈতিকতাওআধ্যাত্মিকতা যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জ্ঞানীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এখানে অবিষ্ট। ইসলামি সমাজ মানেই জ্ঞানালোকিত, নৈতিক ও প্রাগ্রসর এক সমাজ। কালের প্রবাহে এ সংস্কৃতিতে অচলাবস্থা আসার সুযোগ নেই। কারণ তাতে আছে কোরআন-সুন্নাহর স্থিতিস্থাপকতা, সঙ্গে আছে জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিশীল চলমানতা। জীবনের পরিসর যতটা, জীবন যেখান থেকে যেখানে যায়, সবখানেই এ সংস্কৃতির অভিগমন রয়েছে। প্রতিটি পরিবর্তিত বাস্তবতাকে নিজের গলনপাত্রে সিদ্ধ করতে পারে এ সংস্কৃতি, নিজস্ব মূলনীতির অনুকূলে। ফলে গতিশীল জীবনের কোনো মাত্রা থেকে সে পিছিয়ে থাকে না। সে নিত্যই চলমান, যেমন চলমান মানবজীবন।

ইসলামী আদর্শের সংস্কৃতি

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি হলো ইসলামী সংস্কৃতি । ইসলামের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মানুষ তার আচার-ব্যবহার, দেহ, মন ও আত্মাকে যেভাবে সংস্কার ও সংশোধন করে, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতি তার আপন বৈশিষ্ট্য ও আপন গুণে গুনান্বিত। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, তাই মানব জীবনের কল্যাণকর সকল কর্মকান্ডই এ সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। এই সংস্কৃতির বিস্তারিত রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবনাচরণের মাধ্যমে তা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কোন সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং

কুরআন-সুন্নাহর ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারেনা। কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতি কোন ভাবেই গ্রহণ করেনা।ইসলামী সংস্কৃতি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এক থাকে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়না। ইসলামী সংস্কৃতি কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত উৎসব ব্যতিত অন্য কোন উৎসব গ্রহণ করেনা।

জীবন চর্চাই সংস্কৃতি। জীবন যেহেতু গতিশীল তাই সংস্কৃতিও সবসময় গতিশীল। জীবনের শুরু যেখান থেকে সংস্কৃতির সূচনা বিন্দুও সেখানেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম জীবন চর্চা যেহেতু মহান আল্লাহর হিদায়াত ও আনুগত্য দিয়েই শুরু। তাই এ প্রথম জীবন চর্চাই ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সূতিকাগার। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এ কথা বলা যায় যে, আদম আ. এর দ্বারাই ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। এবং যুগে যুগে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ স. এর যুগে এসে পূর্ণতায় পৌঁছায়। নবী করীম স. বলেছেন : উন্নত সংস্কৃতি জীবনধারাকে পূর্ণতাদান করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। (ইবন মাজাহ)

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে: আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা। আর এই সফলতা আসবে বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরণের মাধ্যমে। এই সংস্কৃতি এমন একটি নির্ভুল সমাজ কায়েম করতে চায়, যা হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ। এর জন্য প্রয়োজন উত্তম চরিত্র ও সৎগুণ।

ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যেখানে একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনাচারের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার কর্মনীতির সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পেশ করে দেওয়া

হয়েছে। সুতরাং একজন মুসলিম তার সাংস্কৃতিক বলয় কোন মানদণ্ডে সাজাবে তার পরিষ্কার ব্যাখ্যাও ইসলাম তাকে নির্দেশ করে দিয়েছে। যেখানে মনগড়া কোনো রীতিনীতি আর আদর্শ প্রতিস্থাপনের কোনো সুযোগ নেই।

একজন মুসলিম পানি পান কোন পন্থায় করবে, খাদ্য কিভাবে গ্রহণ করবে, পোশাক কী ধরনের পরিধান করবে, আনন্দ-বিনোদন কোন পর্যায়ে কতটুকু কিভাবে করতে হবে, তার বিশদ বিবরণ ইসলাম তাকে দিয়ে রেখেছে।কাজেই মুসলিম হিসেবে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক চৌহদ্দির পরিচয় জানা।

ইসলাম যেমন সুন্দর, তেমনি তার সংস্কৃতিও আপন মহিমা ও বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। সংস্কৃতি শব্দ গঠিত হয়েছে সংস্কার থেকে। যার অর্থ শুদ্ধি, পরিমার্জন ও মেরামত।

সুতরাং সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনাচারের এমন সব রীতিনীতি আর আদর্শ, যা ব্যক্তি বা সমাজকে পরিশুদ্ধ করে তোলে। কাজেই একজন মুসলিম তার ব্যক্তি বা সমাজজীবনে সেই সব রীতিনীতি আর আদর্শেরই শুধু প্রতিফলন ঘটাবে, যা ইসলাম তাকে শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম তাকে যেভাবে যেখানে যে ধরনের কথা, কাজ, আচরণ আর আর্দশ শিক্ষা দিয়েছে, সে সবই তার সাংস্কৃতিক চৌহদ্দী। এর বাইরে কোনো রীতিনীতি আর আদর্শ কিছুতেই একজন মুসলিমের সংস্কৃতি হতে পারে না।

কারণ মুসলিম সংস্কৃতিক মূল উপাদান হচ্ছে পবিত্র কোরআন ও রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ। সেই সঙ্গে ভাষা, বর্ণ ও ভৌগোলিক সীমারেখাভেদে নিজ নিজ এলাকার সব রীতিনীতি শুধু একজন মুসলিম অনুসরণ করতে পারে, যেগুলো ইসলামী নীতি-আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কোনো অঞ্চলের নিজস্ব রীতিনীতি যদি ইসলামের কোনো বিধানের পরিপন্থী হয়, তাহলে সেসব রীতি কিছুতেই মুসলিম সংস্কৃতির অংশ হতে পারে না। তা অবশ্যই একজন মুসলিমকে পরিত্যাগ করতে হবে।

একজন মুসলিমকে তার সাংস্কৃতিক চৌহদ্দীর জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি সেটি পরিচ্ছন্নকল্পে সর্বদা সর্বান্তকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে খলিফা উমর (রা.)-এর বিখ্যাত উক্তিটি হতে পারে আমাদের তূর্যধ্বনি। তিনি বলেন, 'আলাইকুম

বিররিবাতিদ দায়িমি...' বিরাত শব্দের ব্যাখ্যা অনেক ব্যাপক। শাব্দিক অর্থে সর্বদা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে থাকা। তবে উমর (রা.)-এর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিজাতীয় রীতিনীতির আগ্রাসন বারবার আঘাত হানতে থাকবে। সুতরাং সদা সজাগ থেকে সেসব প্রতিহত করতে হবে। সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পথ ও মতই হতে পারে মুসলিম সংস্কৃতির একমাত্র চালিকাশক্তি। আর সুন্নাহের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সংস্কৃতির সঠিক চর্চা নিশ্চিত করতে পারলেই সাধিত হবে প্রকৃত সুখ আর সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থা।

ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো

ঈমান তথা ইসলামের প্রত্যয়বাদ সম্পর্কে ওপরের বিস্তৃত আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এর ভিত্তির ওপর গড়া সংস্কৃতির একটা পূর্ণ কাঠামো আমাদের সামনে এসে পড়ে। এ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১.এ সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মতো। এতে আল্লাহর মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিছক একজন 'উপাস্যে'র মতো নয়। বরং পার্থিব মত অনুযায়ি তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন এ বিশাল রাজ্যের বাদশাহ শাহানশাহ। রসূল তাঁর প্রতিনিধি। কুরআন তাঁর আইন গ্রন্থ। যে ব্যক্তি তাঁর বাদশাহীকে স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধির আনুগত্য এবং তাঁর আইন গ্রন্থের অনুসরণ করে সে এই রাজ্যের প্রজা। মুসলমান হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেই বাদশাহ তাঁর প্রতিনিধি ও আইন গ্রন্থের মাধ্যমে যে আইন বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন-তার কার্যকরণ ও যৌক্তিকতা বোধগম্য হোক কি না হোক-বিনা বাক্য ব্যয়ে তার স্বীকার করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তাঁর আইন বিধানকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সিদ্ধান্তের ঊর্ধে স্থান দিতে স্বীকৃত না হবে এবং তাঁর আদেশাবলী মানা বা না মানার অধিকারকে নিজের জন্যে সুরক্ষিত রাখবে, তার জন্যে রাজ্যের কোথাও এতটুকু স্থান নেই।

২. এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের (অর্থাৎ পরকালীন বিচারে বিশ্ব প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার) জন্যে প্রস্তুত করা আর তার দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জনটা বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরনের ওপর নির্ভরশীল। পরন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন্ সব কাজ উপকারী, আর কোন্ সব কাজ অপকারী, তা জানা মানুষের সাধ্য নয়, বরং আখেরাতে ফয়সালাকারী আল্লাহই তা উত্তমরূপে অবহিত। এ কারনেই এ সংষ্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুসনণ করার এবং নিজের কর্ম স্বাধীনতাকে খোদায়ী শরীয়ত দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষের কাছে দাবী জানায়। অনুরূপভাবে এ সংস্কৃতি হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহত্তম সমন্বয়। একে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে 'ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করা চলে না। এ হচ্ছে একটি ব্যাপকতর জীবনব্যবস্থা বা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজ-কর্ম, সামাজীক ক্রিয়া-কান্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপরই পরিব্যাপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন-বিধান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচ্ছে 'দ্বীন ইসলাম' বা 'ইসলামী সংস্কৃতি'।

৩. এ সংস্কৃতি কোন জাতীয়, (ভৌগলিক বা ভাষাগত অর্থে) দেশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এ মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই আহবান জানায়। যে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত, কিতাব ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাকেই সে নিজের চৌহদ্দির মধ্যে গ্রহণ করে। এমনিভাবে এ সংস্কৃতির এক বিশ্বব্যাপী উদার জাতীয়তা গঠন করে –যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা। সমগ্র আদম সন্তানকে একই জাতীয় সূত্রে সম্পৃক্ত করার এবং তাদের সবাইকে একই সংস্কৃতির অনুসারী করে তোলার মতো যোগ্যতারও সে অধিকারী। কিন্তু এ বিশ্বব্যাপী মানবীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা তার আসল লক্ষ্য শুধু নিজ অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করারই নয়, বরং মানব জাতির রব তার মঙ্গল ও ভালাইর জন্যে যে নির্ভুল

জ্ঞান ও কর্মনীতি দান করেছেন, সমগ্র মানুষকে তার সুফলের অংশীদার করে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪. সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সাথে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এর সাহায্যেই সে নিজের অনুসারীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে। এর কারণ এই যে, আইন প্রণয়ন ও সীমা নির্ধারণ করার পূর্বে সে আইনের অনুসরণ ও সীমা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে নেয়। অন্য কথায়, আদেশ দেয়ার পূর্বেই সে আদেশ দ্বারা কার্যকরী হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। এ জন্যে সর্বপ্রথমে সে মানুষের আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। তারপর তাকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা আল্লাহরই বিধান এবং তার আনুগত্য ঠিক আল্লাহরই আনুগত্য। পরন্তু তার মনের ভেতর সে এক অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দেয়-সে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তাকে খোদায়ী বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করে, তার বিরুদ্ধাচরণের জন্যে তিরষ্কার করে এবং পরকালীন শাস্তির ভয় দেখায়।

৫. পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে এবং এক সৎ ও পবিত্র জনসমাজ (Society) গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা উত্তম চরিত্র ও সদগুনরাজতে বিভূষিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ সমাজ গঠন সম্ভবপর নয়। এ কারণেই এর সভ্যদের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে করে অতি স্বাভাবিকভাবে সৎ কর্মরাজির অনুশীলন হওয়ার মতো সুদৃঢ় চরিত্র তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত ইসলাম তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় এ নিয়মটির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখেছে। লোকদের ট্রেনিং-এর জন্যে ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়কে বদ্ধমূল করে দেয়-কারণ তাদের মধ্যে উঁচুমানের মযবুত চরিত্র সৃষ্টি করার এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এ ঈমানের বলেই সে লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মনুশীলন, সত্য প্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদার দৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, উচ্চাভিলাস, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ,

ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, বীর্যবত্তা, আত্মতৃপ্তি, নেতৃ আনুগত্য আইনানুবর্তিতা ইত্যাকার উৎকৃষ্ট গুনরাজির সৃষ্টি করে।

৬. এ সংস্কৃতির ঈমান তথা প্রত্যয়বাদে একদিকে সচ্চরিত্র ও সৎ গুনরাজি সৃষ্টি করায় এবং তা প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের উপযোগী সকল শক্তি বর্তমান রয়েছে। অন্যদিকে পার্থিব উপায়-উপকরণ উত্তমরুপে ব্যবহার করার ও আল্লাহর দেয়া শক্তি নিচয়কে সুষমভাবে প্রয়োগ করার জন্যে যোগ্য করে তোলার মতো শক্তিও এর ভেতরেই নিহিত রয়েছে। পরন্তু এ প্রত্যয়বাদই দুনিয়ার প্রকৃত উন্নতি করার জন্যে প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুনাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচন্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে। সেই সাথে এ কর্মশক্তিকে সীমাতিক্রম করতে না দেয়ার এবং সত্যিকার কল্যাণ পথ থেকে বিচ্যুত হতে না দেয়ার শক্তিও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব

এ হচ্ছে ইসলামের প্রতিষ্টিত সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো। ঈমানের অনুপস্থিতি ইসলামেরই অনুপস্থিতির শামিল। অনুরূপভাবে ঈমানের দুর্বলতা তারই দুর্বলতা এবং ঈমানের শক্তি তারই শক্তির নামান্তর পরন্তু ইসলাম যেহেতু একটি ধর্ম মাত্রই নয়, বরং এটি সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি সবকিছুরই সমন্বয়, এ কারণে এখানে ঈমানের গুরুত্ব নিছক ধর্মীয় বিন্যাসের মতোই নয়; বরং এর ওপর লোকদের গোটা নৈতিক আচরণ ও জীবনধারা একান্তভাবে নির্ভরশীল। এটিই তাদের পারস্পারিক ক্রিয়াকর্মের সুস্থতা পরিচ্ছন্নতার প্রধান অবলম্বন। এটিই তাদেরকে সংহত করে একটি জাতিতে পরিণত করে। এটিই তাদের জাতীয়তা ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা বিধান করে। এটিই তাদের সভ্যতা, সামাজিকতা ও রাজনীতির মূল প্রাণবস্তু। এটি ছাড়া ইসলাম শুধু একটি ‘ধর্ম’ হিসেবে কায়েম হতে পারে না তাই নয়, বরং একটি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবেও প্রতিষ্টা লাভ করতে পারে না। ঈমান দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে শুধু

ধর্মীয় বিশ্বাসেরই দুর্বলতা বলা চলে না, বরং তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, মুসলমাদের নৈতিক জীবন খারাপ হয়ে গেছে। তাদের স্বভাব-চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের পারস্পারিক ক্রিয়াকর্ম বিগড়ে গেছে। তাদের সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তাদের জাতীয়তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। একটি স্বাধীন, সম্মানিত ও শক্তিমান জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে। বস্তুত এ কারনেই ইসলামী ব্যবস্থায় ঈমানকেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এক ব্যক্তি যখন ঈমান কবুল করলো, তখন সে মুসলিম জাতির মধ্যেই প্রবেশ করে; মুসলমানদের সভ্যতা, সামাজিকতা, রাজনীতি সবকিছুতে সে সমান অংশীদার হয় এবং সমস্ত রীতিনীতি ও আইন-কানুন তার প্রতি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি ঈমান কবুল না করে তাহলে ইসলামের সীমার মধ্যে সে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের জামায়াতে সে কিছুতেই শরীকদার হতে পারবে না। কারণ এ ব্যবস্থাপনায় তার পক্ষে খাপ খাওয়ানো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এর আইন-কানুন ও বিধি ব্যবস্থা সে কিছুতেই পালন করতে পারে না।

মুনাফেকীর ভয়

যারা ঈমানের দাওয়াতকে খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ব্যাপার তো সুস্পষ্ট। তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের অতি সুস্পষ্ট ও দুর্লংঘ্য সীমারেখা বিদ্যমান। সেই সীমা ডিঙিয়ে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে তারা কখনো অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। কিন্তু যারা মু'মিন না হয়েও ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে ঢুকে পড়েছে, যাদের অন্তরে সন্দেহের ব্যাধি লুকিয়ে রয়েছে কিংবা যাদের বিশ্বাস অতি দুর্বল তাদের অস্তিত্ব ইসলামী ব্যবস্থার পক্ষে অতীব মারাত্মক। কারণ তারা ইসলামের সীমার মধ্যে দাখিল হলেও ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী জীবনধারা গ্রহণ করেনি। তারা ইসলামী আইনের অনুসরণ এবং আল্লাহর বিধানের সংরক্ষণ করেনি; বরং তারা নিজেদের বিকৃত চরিত্র ও আচরণ দ্বারা মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ও বিকৃত করে দিচ্ছে, নিজেদের মানসিক ব্যাধির সাহায্যে মুসলমানদের জাতীয়তা ও রাজনৈতিক

ব্যবস্থার শিকড় উপড়ে ফেলছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ভেতর ও বাইর থেকে নানারুপ ফেতনা সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকদেরকেই মুনাফেক বা কপট বিশ্বাসী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এদের অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম সমাজে যেসব ফেতনার সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেগুলোও সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

"যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা ঈমানদার নয়।" –(সূরা আল বাকারা: ৮)

"তারা ঈমানদার লোকদের সাথে দেখা হলে বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি আর তাদের শয়তানদের কাছে গেলে বলে যে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি।"

– (সূরা আল বাকারা: ১৪)

তারা মুসলমানের সাথে ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তাদের স্বার্থ থাকে। যেখানে স্বার্থ থাকে না কিংবা কম থাকে, সেখানেই তারা মুসলমানদের সঙ্গ ত্যাগ করে।

যখন ইসলাম ও মুসলমানের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসে তখন তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে; কারণ ইসলামের প্রতি তাদের আদতেই কোন ভালোবাসা নেই। তারা স্বার্থে জীবন পণ করতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা নানাভাবে যুদ্ধ থেকে দুরে থাকার এবং নিজেদের জীবন বাঁচার চেষ্টা করে। আর কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও নিতান্ত অপ্রসন্নচিত্তেই করে। ফলে তাদের এ অংশগ্রহণ মুসলমানদের জন্য শক্তির পরিবর্তে দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের এ অবস্থাটিই সূরায়ে আলে ইমরান (রুকূঃ ১২-১৭), সূরায়ে আন নিসা (রুকূঃ ১০, ১১, ১২, ২০), সূরায়ে আত তাওবা (রুকূঃ ৭, ১১, ১২) এবং সূরা আহযাব (রুকূঃ ২)-এ সবিস্তারে বিবৃত করা হয়েছে।

এদের সবচেয়ে মারাত্মক পরিচয় হলো এই যে, মুসলমানদের উপর যখন বিপদের ঘনঘটা নেমে আসে, তখন এরা কাফেরদের পক্ষে গিয়ে যোগদান করে। তাদেরকে মুসলমানের ভেতরকার খবর সরবরাহ করে। তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে।

মুসলমানদের বিপদ দেখে খুশী হয়।এ পরিচয়টিও আলে ইমরান, নিসা, তাওবা, আহযাব এবং মুনাফিকুন-এ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর থেকে ভালো মতোই আন্দাজ করা চলে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার জন্য খাঁটি, নির্ভুল ও যথার্থ ঈমান একান্ত আবশ্যক। ঈমানের দুর্বলতা এ ব্যবস্থার মূল শিকড় থেকে নিয়ে ডালপালা পর্যন্ত সবটাকেই অন্তসারশূন্য করে দেয়। এর মারাত্মক প্রভাব থেকে সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি কোন কিছুই রক্ষা পেতে পারে না।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

পাশ্চাত্য/পশ্চিমা সংস্কৃতি বলতে মূলত আধুনিক সংস্কৃতিকেই বুঝায়। যাতে কোন ধর্মের ছোঁয়া নেই, নেই কোন নৈতিকতা, মানবিকতা ও শালীনতা। এতে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর নির্দেশ পালন করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এটি একটি উলঙ্গপনা (Free sex) সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি

আধুনিক সংস্কৃতির ভিত্তি হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ খৃষ্টবাদ, ইহুদিবাদ, পুঁজিবাদ ও অন্যান্য পার্থিব মতবাদ। যার মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্মহীনতা। এই সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নির্বিচারে গ্রহণ করা এবং যারা এর বিপরীতে দাঁড়ায় তাদেরকে অসভ্য ও পশ্চাতপদ গণ্য করা।

পশ্চিমা সংস্কৃতির কতগুলো দিক

১. বাঙালি সংস্কৃতি

২. হিন্দি সংস্কৃতি

৩. প্রাচ্য সংস্কৃতি

৪. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ক্ষুদ্র রূপায়ন

ক. স্যাটেলাইট সংস্কৃতি।

খ. সিনেমা বা চলচিত্র সংস্কৃতি।

গ. অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন সংস্কৃতি।

ঘ. সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও মডেলিং সংস্কৃতি।

ঙ. পার্লার সংস্কৃতি।

চ. দিবস পালন/উৎসব সংস্কৃতি।

ছ.গায়ে হলুদ সংস্কৃতি।

জ.পহেলা বৈশাখ সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

১. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মূলত একটি ধর্মহীন সংস্কৃতি । যা মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে নষ্ট করে দেয়। ফলশ্রুতিতে সে তার ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং এটি মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূল (সা.) এর অনুসরণ থেকে বিমুখ করে।

২. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে জীবনের দৃশ্যমান ও আনুভূতিক শিল্পময় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। আর এতে লাগামহীন জীবন যাপনের উলঙ্গতাকে নানাভাবে বর্ণময় করার চেষ্টা দেখা যায়।

৩. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিভিন্ন উৎসব সাদরে গ্রহণ করে নেয়, ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই। যেমন- শবে বরাত, থার্টি ফাস্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন ডে, এপ্রিল ফুল, বিবাহ বার্ষিকী, জন্ম দিন, গায়ে হলুদ উৎসব, মহররম উৎসব ইত্যাদি।

৪. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বংশানুক্রমে অতিবাহিত হতে থাকে। যদিও এর মধ্যে কুফরী কোন সংস্কৃতি থাকে তবুও,বংশানুক্রমে তার ধারা বজায় থাকে।

৫. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি একটি প্রতিযোগিতা মূলক সংস্কৃতি। যার কারণে এর ধারা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হয় এবং এটি বিশ্বে আলোচিত অনেক কিছু সাদরে আপন করে নেয়।

৬. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুসলমানদের ঈমানী চেতনাকে নষ্ট করে দেয়। যার কারণে সে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। আর অন্য দিকে ইসলামী সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে কেবল আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর উপর নিঃশংসয়ভাবে বিশ্বাসী মুমিনদের জীবন যাপনকে কেন্দ্র করে। যেখানে অবিশ্বাসী হওয়ার বা কুরআন-হাদীস অনুসৃত জীবন যাপনের বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

অন্য জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন,“যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য ধারণ করলো সে তাদেরই দলভুক্ত হলো।” (সুনানে আবু দাউদ :৪০৩১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, তিন প্রকারের লোক আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত, ১. হারাম শরীফের পবিত্রতা বিনষ্টকারী, ২. ইসলামে বিজাতীয় রীতি-নীতির (সংস্কৃতির) প্রচলন কারী, ৩. কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রচেষ্টাকারী। (বুখারি)

পাশ্চাত্যে সংস্কৃতির আগ্রাসন

১. সেকুলারিজম

ল্যাটিন ভাষার শব্দ সেক্যুলারের অর্থ হচ্ছে আখেরাতের বিপরীতে পার্থিব এই বিশ্বের বিধি-বিধান। খ্রিষ্টিয় তৃতীয় শতকে এই শব্দটি খ্রিষ্টান ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাদের মধ্য থেকে যারা বৈরাগ্য জীবন অর্থাৎ সন্ন্যাসী জীবন ত্যাগ করেছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে মুসলিম বিশ্বে এই সেক্যুলারিজম শব্দটি প্রবেশ

করার ফলে ফার্সি, তুর্কি এবং আরবি ভাষায় এই শব্দটির বহু প্রতিশব্দ তৈরি হয়ে যায়। ফার্সি ভাষায় সেক্যুলারিজম শব্দটির জন্যে পার্থিব জগত পূজা, দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়া, রাজনীতি থেকে দ্বীনকে পৃথক করা ইত্যাদি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে মুসলিম দেশগুলোতে সেক্যুলারিজমের প্রবেশের ঘটনা কয়েক শতাব্দি আগে ঘটেছে। সতেরো শতকে উপনিবেশবাদীদের আগ্রাসনের সূচনালগ্নে বিশেষ করে ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তারের সময় কিংবা বলা যায় ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে ন্যাপোলিয়নের আগ্রাসনকালে মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজম প্রবেশ করে।

মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলো বর্তমানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের লিবারেল ডেমোক্রেসি এবং সেক্যুলারিজম মতবাদের বিস্তার ঘটাতে। এগুলোর বিস্তার ঘটানোর মাধ্যমে অন্যান্য সমাজের দ্বীনী বিশ্বাসগুলোতে রূপান্তর আনতে চায় পাশ্চাত্য। লক্ষ্য হলো পশ্চিমা চিন্তাদর্শের বাইরে যেসব ধর্মবিশ্বাস বা মতবাদের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোকে ব্যর্থ বলে প্রমাণ করানো। কিন্তু ইসলামী দ্বীন সেক্যুলারিজমের বিশ্বাসের বিপরীতে রাষ্ট্র এবং সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।”

ইসলামের বিরুদ্ধে আরো দুটি মতবাদ ছিল হিউম্যানিজম এবং ন্যাশনালিজম। এই দুটি মতবাদও গভীর অর্থে দ্বীন এবং স্রষ্টা বিরোধী। এভাবে শিল্প বিপ্লব এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পাশ্চাত্যের জনগণ পুরোপুরিই দ্বীন এবং দ্বীনী নীতিমালা আচার-প্রথা থেকে দূর সরে যায়। যার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বীনের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তবু আজো টিকে আছে ইসলাম, টিকে আছে দ্বীন এবং মুসলমানদের সরব উপস্থিতি।

২. সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু

সমকামিতা হল একই লিঙের প্রতি আকর্ষণ।

ইদানীং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ‘ট্রান্সজেন্ডার’ মানুষ নিয়ে আলোচনা হতে দেখা যায়, যাদের বেশির ভাগ তৃতীয় লিঙ্গের মনে করলেও মূলত তারা তৃতীয় লিঙ্গের নয়। বরং তারা বিশেষ অস্ত্রোপচার ও হরমোন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে রূপান্তরিত লিঙ্গের ব্যক্তি,

যারা মানসিক দিক থেকে তাদের সৃষ্টিগত লিঙ্গের চেয়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বেশি আসক্ত ছিল। ফলে একসময় তারা অস্ত্রোপচার ও হরমোন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের দেহাবয়ব পরিবর্তন করে বিপরীত লিঙ্গের বেশ ধারণ করেছে।

তবে মাঝে মাঝে বিস্তৃত পরিভাষায় রূপান্তরিত লিঙ্গ বা ট্রান্সজেন্ডার বলতে ‘ক্রস-ড্রেসার’ বা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধানকারীদেরও বোঝানো হয়, বাস্তবে তাদের লিঙ্গবোধ যাই হোক না কেন।যেসব নারী পুরুষের বেশভূষা নিতে চায়, যেসব পুরুষ নারীর বেশভূষা নিতে চায়, মহানবী (সা.) তাদের অভিসম্পাত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল (সা.) নারীর বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের অভিসম্পত করেছেন। ’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৭৮৫)

উল্লেখ্য, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে তাদের প্রথম শ্রেণির নাগরিক হিসেবে দেখা হয়, সব ধরনের আইনি,রাজনৈতিক সব সেবাই তারা অগ্রগণ্য হিসেবে পেয়ে থাকে।

৩. থার্টি ফার্স্ট নাইট

জানুয়ারি মাসের পহেলা তারিখ ইংরেজি বছরের প্রথম দিন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কল্যাণে (!) ইংরেজি নববর্ষ এখন অশ্লীতা আর নোংরামির হাতেখড়ি হিসেবে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। অবশ্য ইংরেজি নববর্ষের সঙ্গে উচ্ছৃংখলতার সম্পর্ক নতুন নয়। স্যার জেমস ফ্রেজার তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দ্য গোল্ডেন বাও’-এ লেখেন, ‘নববর্ষ উপক্ষে আমেরিকান আদিবাসী নারী-পুরুষদের আচরণ ছিল কা-জ্ঞানহীন মানুষের মতো। বিভিন্ন সাজে সজ্জিত নারী-পুরুষরা এ বাড়ি ও বাড়ি ছুটে বেড়াতো আর সামনে যা পেত ভেঙ্গে ফেলত। শুধু যে অন্যের সম্পদের ক্ষতি করতো তা নয়; নিজেদের কাপড়চোপর এবং আসবাবপত্রও ভাঙচুর করতো তারা। পুরোনো বছরের সঞ্চয় ও সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে নতুন বছরে নতুন জীবন শুরু করো- এ দর্শনই আমেরিকানদের উগ্রপথে বর্ষবরণে উদ্বুদ্ধ করে। সেখানকার আদিবাসীদের দেখাদেখি অভিবাসী আমেরিকানরাও নববর্ষে ভয়াবহ রকমের অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন করতে লাগলো। অগ্ন্যুৎসব, শব্দ দূষণসহ নানান

কর্মকা- করে ভীতিকর পরিস্থিতিতে ৩১ ডিসেম্বর রাত অতিবাহিত করে নতুন বছরের নতুন সূর্যকে স্বাগত জানাতো তারা।

সময় পাল্টেছে। দিন বদলেছে। এখন আর অন্যের বা নিজের আসবাবপত্র ভেঙ্গে নববর্ষ উদযাপন করা হয় না। এখন নতুন বছরের নতুন সূর্যকে স্বাগত জানানো হয় নিজেকে ধ্বংস করে। একত্রিশ ডিসেম্বর রাত বারোটার পরপরই 'নিউ ইয়ার' উদযাপনে তরুণ-তরুণীরা ধর্ম ও নৈতিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে নাচ-গান ও মদ-ইয়াবায় মেতে ওঠে। না, ইউরোপ-আমেরিকা বা অন্য কোনো পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের নববর্ষ উদযাপনের কথা বলছি না। বলছি, বারো আউলিয়ার পূণ্যভূমি বাংলাদেশে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন সম্পর্কে। ভাবতেও কষ্ট হয়! একটি ভিন্ন জাতির উৎসবকে কেন্দ্র করে কীভাবে আরেকটি জাতি নিজের বিশ্বাস-সম্পদ ও সংস্কৃতিকে বিলিয়ে দেয়।এসব সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির আকাশ-পাতাল ব্যধান। থার্টিফার্স্ট নাইট, ভেলেন্টাইনস ডে-সহ ইংরেজি বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করার মাধ্যমে আমরা আমদে দেশীয় এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংকটাপন্ন করে তুলছি। পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী নয়। ইন্দ্রীয় সুখ লাভ এবং জীবন উপভোগই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ জন্য তারা কোনো আইন কিংবা বাধানিষেধের ধারধারে না। তারা আরো বিশ্বাস করে, এ জীবনই শেষ জীবন। এরপর আর কোনো জীবন নেই। নেই জবাবদিহির মতো গুরু দায়িত্বও। অপর দিকে আমাদের দেশের প্রায় শতভাগ মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী। তারা পরজীবনে জবাবদিহির বিষয়টি গভীরভাবে লালন করে এবং বাস্তব জীবনে এর কঠোর অনুশীলনের চেষ্টা করে। সুতরাং আমাদের এবং পশ্চিমাদের জীবনাচার এবং সংস্কৃতির যে বিরাট পার্থক্য থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের সঙ্গে বিশ্বাস ও চিন্তায় এত বৈপরিত্যপূর্ণ একটি জাতির সংস্কৃতি যখন আমরা চর্চা করতে থাকি তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিশ্বাসও আমাদের মনমননে গেঁথে যেতে থাকে। যে কারণে পাঁচ বছর আগের বাংলাদেশকে পাঁচ বছর পরের বাংলাদেশের সঙ্গে মেলাতে গেলে রীতিমত আঁতকে ওঠতে হয়।

আজকের এ জাতীয় অধঃপতন যে বিজাতীয় সংস্কৃতিরই পরিণাম ও ফায়দা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

থার্টিফার্স্ট নাইটকে কেন্দ্র করে যেকোন ধরনের নৈরাজ্য রোধে প্রতিবছরই সরকার ও আইনশৃ্ৃংখলা বাহিনী তৎপর থাকেন। তবে আফসোস! অশ্লীলতা এবং কথিত ‘তারুণ্যের উম্মাদনা’ রোধে কারোই কোনো ভাবনা থাকে না। বরং আইনশৃংখলা বাহিনীর তত্ত্বাবধানেই নাচগান, মদপান ও শ্লীলতাহানির মতো ঘৃণ্য কাজগুলো ঘটে থাকে। কয়েক বছর আগে টিএসসি চত্বরে নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, এসব অপসংস্কৃতি এদেশের তরুণ-তরুণীদের জন্য কতটা বিপদজনক। ‘নিউ ইয়ার’ উদযাপনকে কেন্দ্র প্রতি বছরই শ্লীলতাহানির ঘটে, এবারও ঘটবে হয়তো।মুসলিম হিসেবে আমাদেরও রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি এবং হিজরি সন। বিজাতীয় (অপ)সংস্কৃতি চর্চায় গা ভাসিয়ে না দিয়ে দেশীয় এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি চর্চায় মুসলিম তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে আলেম-ওলামাদের বিশেষ ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪. জন্মোৎসব সংস্কৃতি

আমাদের সমাজে জন্ম তারিখ (বার্থ-ডে) কেন্দ্র করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শীদের উপস্থিতিতে জন্মোৎসব নামের অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। ইসলাম কারো জন্ম বা মৃত্যু দিবস উদযাপন সমর্থন করে না। জন্মবার্ষিকী পালন করা বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের নাম দিয়ে প্রচুর টাকা অযথা অপচয় করা হচ্ছে। কেক কাটা, মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে এতে অনর্থ অর্থ ব্যয় করা হয় যা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। কেবল জন্মোৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে নয় একজন মুসলমানের উচিত জীবনের সব ক্ষেত্রে অপচয় থেকে বিরত থাকা। অপচয়ের মতো অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করে আল্লাহপাক কোরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন, ‘আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।’ (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত-২৬,২৭)

আল্লাহপাক এরশাদ করেন, ‘তোমরা আহার করবে ও পান করবে। কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।’ (সুরা আল আরাফ, আয়াত-৩১)

৫. পয়লা বৈশাখ সংস্কৃতি

বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নাম দিয়ে প্রচুর টাকা অযথা অপচয় করা হচ্ছে। পান্তা-ইলিশ ও বৈশাখি ড্রেসসহ গান-বাজনার মাধ্যমে এ দিবসটি উদযাপিত হয়। পহেলা বৈশাখের সকালে পান্তা খাওয়ার প্রথা এবং শাদা শাড়ি প্রভৃতি হলো পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদযাপনের প্রধান উপাদান। আর এসব কর্মকাণ্ড ইসলামে হারাম। হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো ধর্মের মানুষের (ধর্মীয় আচারের) অনুকরণ বা সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪০৩১) নববর্ষের অনুষ্ঠানে চরমভাবে লঙ্ঘিত হয় ইসলামের পর্দার বিধান। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বিচরণ ও নারীকে জড়িয়ে নানা রকম অশ্লীলতা সৃষ্টি হয়, অথচ ইসলামে পর্দা করা ফরজ। আল্লাহপাক এরশাদ করেন, ‘হে নবী! আপন বিবি, কন্যা এবং মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের শরীর ও মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে।’ (সুরা আহজাব, আয়াত-৫৯) পহেলা বৈশাখকে গান-বাজনার মাধমে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে উন্মুক্তভাবে গান-বাজনার ছড়াছড়ি। অথচ আল্লাহপাক গান-বাজনাকে হারাম করেছেন। হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘গান মানব অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে; যেমন পানি রবিশষ্য উৎপাদন করে।’ (রুহুল মাআনি-৭/৬৮) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ‘গানবাদ্য শ্রবণ করা কবিরা গুনাহ এবং গানের অনুষ্ঠানে বসা ফাসেকি আর এর দ্বারা আনন্দানুভব করা কুফরি। (আবু দাউদ, হাদিস নং-৬৭৪)

৬. শোক প্রকাশ সংস্কৃতি

আমাদের সমাজে শোক পালন হচ্ছে মনগড়া রীতিতে যা ইসলাম সমর্থন করে না। কারো শোক প্রকাশে মাথায় কালো পট্টি বাঁধা বা এক মিনিট দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ

করা ইসলামে বৈধ নয়। শোক পালনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো কোনো মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবেন। এছাড়া অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করতে পারবেন।

৭. এপ্রিল ফুল সংস্কৃতি

পহেলা এপ্রিলের সাথে জড়িয়ে আছে মুসলমানদের বেদনাময় এক ইতিহাস। পশ্চিমা বিশ্ব ও খ্রিস্টানদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। তারা সীমাহীন আনন্দের সাথে এ দিবসটি পালন করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিজাতীয় গোষ্ঠীর কালচার মুসলমানদের কেউ কেউ পালন করছেন। এ দিন আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা একে অন্যকে বিভিন্ন কৌশলে ধোঁকা দিয়ে বোকা সাজিয়ে হাসি তামাশায় মেতে ওঠেন। ১ এপ্রিল বা এপ্রিল ফুল-ডে এর সাথে জড়িয়ে আছে মুসলিম মিল্লাতের রক্তঝরা এক কালো অধ্যায়। এর ইতিহাস জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৪৯২ সালে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস মিথ্যাবাদী প্রতারক কুখ্যাত ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলার খ্রিস্টান বাহিনী শহরে প্রবেশ করে মুসলমানদেরকে মসজিদের ভেতর আটকে রেখে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। এরপর রাতের আঁধারে একযোগে শহরের সমস্ত মসজিদের চারপাশে আগুন লাগিয়ে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী নিরস্ত্র নিরপরাধ মুসলিম শিশু-বৃদ্ধ নরনারীকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে। অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশু অসহায় আর্তনাদ করতে করতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান মসজিদের ভেতর। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধ অসহায় মুসলিমদের আর্তচিৎকার যখন গ্রানাডার আকাশ-বাতাস ভারী ও শোকাতুর করে তুললো, তখন ফার্ডিন্যান্ড রাণী ইসাবেলা আনন্দে আত্মহারা হয়ে হেসে বলতে লাগলো, হায় মুসলিম! (হায় এপ্রিল ফুল) এপ্রিলের বোকা। মুসলিমদের বোকা বানিয়ে মুসলিম ইতিহাসের এক রক্তাক্ত জঘন্য উৎসবে মেতেছিল খ্রিস্টানরা। একদিন যে কর্ডোভা ও গ্রানাডার মসজিদগুলো থেকে পাঁচ ওয়াক্ত আজান ধ্বনিত হতো, আন্দোলিত হতো স্পেনের মুসলমানদের হৃদয়, আজ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সব গীর্জার স্তম্ভ। এপ্রিল ফুল দিবস উদযাপন করা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থি। হাদিসের মধ্যে রাসুল (সা.) ধোঁকাবাজির পরিণাম সর্ম্পকে

এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (মুসলিম, হাদিস নং-২৪৮) রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, 'অভিশপ্ত ওই ব্যক্তি যে কোনো মুমিন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করে কিংবা তাকে ধোঁকা দেয়।' (মিশকাত, হাদিস সং-৪২৮)

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি রোধে ইসলামিক সংস্কৃতি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামী জীবনাদর্শ ও শরিয়ার বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে যে প্রভাব পরিলক্ষিত এবং কল্যাণকর বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে তাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনসত্তার অন্তরঙ্গ ও বহিরাঙ্গের সামগ্রিক রূপ। সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার, বিশ্বাসলব্ধ মূল্যবোধে উদ্ভাসিত, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত মন-মানসিকতাকেই সংস্কৃতি বলা হয়। ইসলামের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে মানুষ তার আচার-ব্যবহার, দেহ, মন ও আত্মাকে যেভাবে সংস্কার ও সংশোধন করে, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হলো কোরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং কোরআন-সুন্নাহর ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় সংস্কৃতি হলো জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নিয়ম-নীতি, সংস্কার ও অন্যান্য দক্ষতা যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করে। অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো মানুষের আচরণের সমষ্টি।

ইসলামী সংস্কৃতি যেমনভাবে মানুষকে সুসংহত করতে পারে, তেমনি অপসংস্কৃতি মানুষকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে। সংস্কৃতি যদি মানবতা ও নৈতিকতাবিবর্জিত হয় এবং ধর্মীয় নীতির অনুকূলে না হয়। আমরা মুসলমান জাতি হওয়ার কারণে আমাদের শিষ্টাচার, সংস্কৃতিও হতে হবে ইসলামী। কোরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। কোরআন-সুন্নাহর সীমানা ও চিরায়ত রীতির পরিপন্থি যা কিছু হবে সবই মুসলমানদের জন্য অপসংস্কৃতি।

মুসলিম উম্মতের অভ্যন্তরে বিজাতীয় যে কোনো জাতির আচার-আচরণ, পোশাক ইত্যাদিসহ সব ধরনের সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটা অপসংস্কৃতি। আর এসব অপসংস্কৃতির

আগ্রাসনে মুসলিম উম্মাহ আজ আক্রান্ত। বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান দেশ হলেও আজ অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে মুসলমান তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চায় মত্ত। পশ্চিমা বিশ্বের অপসংস্কৃতির বিষবৃক্ষ আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর পূর্বে ব্রিটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে রোপণ করেছিল, ফল দিতে শুরু করেছে। আড়াইশ বছর আগের বৃক্ষের ফল খেয়ে আজ মুসলিম উম্মাহ আক্রান্ত। তিক্ত হলেও সত্য যে, ইসলামী সংস্কৃতি আজ মাতৃকোলচ্যুত হয়ে ভূতের কোলে ঠাঁই নিয়েছে।

অপসংস্কৃতির কালো থাবায় জাতি আজ আহত। পশ্চিমা বিশ্বের পরিত্যক্ত কৃষ্টি-কালচার আজ মুসলিম জাতিও পালন করতে শুরু করেছে। আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবহে ধূমায়িতপ্রায়। অপসংস্কৃতির ছোবলে গোটা সমাজ ক্রমশ দূষিত হয়ে উঠেছে। এর ফলে বিলুপ্ত হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি। মুসলমানদের গোটা জীবনই সংস্কৃতি। আমাদের জীবনের প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আহারে, বিহারে, অজু, গোসলে, আমোদ-প্রমোদে, আপ্যায়নে-অভ্যর্থনায়, হাঁটা-চলায়, আলাপ-আলোচনায় সর্বক্ষেত্রেই মিশে আছে রক্তের মতো দেহের স্পিরিট শিরা-উপশিরায়। দেহের রক্তের সঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতির তুলনা করা যায়। রক্তশূন্য দেহ প্রাণহীন একটি লাশ মাত্র। আর সংস্কৃতিবিহীন মানবদেহ পাথরের সমতুল্য।

ইসলামের সংস্কৃতি শুধু দীন বা ইবাদত, বিচ্ছিন্ন নয়। জীবন-বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির অনুষ্ঠান পালনের জন্য মুসলমানদের আলাদা আয়োজনের তেমন প্রয়োজন হয় না। এ জন্য মুসলমানের ইসলামী জিন্দেগি সবটাই সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতি অনুষ্ঠাননির্ভার নয়। ইসলামী সংস্কৃতি আবার বিশেষ স্বকীয় অনুষ্ঠানকে অস্বীকারও করে না। ইসলামী সংস্কৃতির একটি মানদণ্ড আছে তা আল্লাহ প্রদত্ত। এই মানদণ্ড নির্ণয় করে সংস্কৃতি পালন করাই মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু সমাজে এমনও অনেক মুসলমান রয়েছেন যারা ইসলামী সংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতির নির্ণয়ে অসচেতন। যার কারণে মুসলিম পরিবারেও প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে অপসংস্কৃতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ইসলামী সংস্কৃতি পরিহার করে সংস্কৃতির নামে চালানো হচ্ছে ভয়াবহ অপসংস্কৃতি।

তরুন-তরুনীদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আধিপত্যবাদী এই সংস্কৃতি ক্রমেই ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ মুসলিম প্রজম্ম আরও বেশি হুমকির সম্মুখিন হতে পারে। আধুনিকতা, স্বাধীনতা আর সাম্যের নামে তারা মুসলিম বিশ্বে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাচ্ছে। ফলে মুসলিম উম্মাহ আজ সাংস্কৃতিক অরাজকতা আর বিচ্যুতিতে ভুগছে, যা সামাজিক শৃঙ্খলাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এর ফলে মুসলিম নারী-পুরুষেরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্তব্য ও অঙ্গীকার ভুলে যাচ্ছে। তাই সমাজকে অবিশ্বাসর অতল গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পথভ্রষ্ট প্রজম্মকে আল্লাহর দ্বীনের সঠিক পথে আনা খুবই কঠিন কাজ। আমাদের লক্ষ্য হলো এই কঠিন কাজকে সহজ করা এবং ইসলামী ধারণা ও মূল্যবোধকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া।

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতি

ইসলাম কেবলই একটি ধর্ম নয়, বরং দ্বীন এবং পরিপূর্ণ জীবন ব্যাবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত একজন মানুষের জীবানাচরণ, রীতি নীতি কেমন হওয়া উচিত, স্বল্প পরিসরের এ জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করলে একজন মানুষ ইহকালে সুখময় জিন্দেগী এবং পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারে তার একটি নিঁখুত ভারসাম্য পূর্ণ বিধান দিয়েছে ইসলাম।

ইসলামে রয়েছে একটি স্বচ্ছ সুন্দর ও সুস্থ সংস্কৃতি। যার অন্যতম লক্ষ হচ্ছে মানুষের জীবনকে সুন্দর করা, সুখ শান্তিময় ও কল্যানময় করা। বর্তমানে এক শ্রেনীর নাম সর্বস্ব মুসলমান ইসলামের এই সুস্থ ও সুন্দর সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যের অশ্লীল,অশালীন ও নগ্ন অসংস্কৃতিক পিছনে পড়েছে যা নিতান্তই মূর্খতাপ্রসূত বিবেক বিবর্জিত।কেননা ইসলামী সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধ, উন্নত, শালীন,মার্জিত, কল্যানকর ও মঙ্গলময়। এ বিষয়টি বাস্তবভাবে বুঝার জন্য পাশ্চাত্য

সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা নিচে পেশ করা হল।

ক. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা : ইসলামে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি অনেক বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রতিদিন অন্তত পাঁচ বেলা প্রতিটি মুসলমানকে নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে এমন কোন বিধান নেই। তেমনি ভাবে স্বামী ও স্ত্রীর যৌন মিলনের পর গোসল করা ইসলামে ফরয, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে যৌনকর্মের পর গোসল করার কোন ধারনাই নাই। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত উযু ও গোসল করা ইসলামীর সংস্কৃতির অংশ। পক্ষান্তরে ইউরোপের সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে পরিচিত ফরাসিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন "চতুর্দশ লুই" তিনি সর্বসাকুল্যে তিনবার গোসল করেছিলেন,দুবারের গোসলে তার কোন হাতই ছিল না। জন্ম ও মৃত্যুর পর জর্ডান নদীর পানি দিয়ে তাকে গোসল দেয়া হয়। আর তার জীবনের তৃতীয় গোসল ছিল প্রথম বিবাহ করার সময়। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায়, পাশ্চাত্য সমাজ শারীরিক ভাবে কতটা অপরিচ্ছন্ন।

খ. দাঁত ও মুখ পরিস্কার করণ : নিয়মিত মুখ পরিস্কার করার জন্য ইসলামে মিসওয়াক ব্যবহার ও কুলি করার বিধান রয়েছে। কেবল ঘুম থেকে উঠার পরই নয়, কমপক্ষে দিনে পাঁচবার নামাযের পূর্বে মিসওয়া করা সুন্নাত। যা দাত ও মুখকে পরিস্কার রাখে, এবং মুখের দুর্গন্ধকে দূর করে। দাতকে করে মজবুত ও উজ্জল। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজে দেখা যায়

যে, সকাল বেলায় বহু নারী পুরুষ নিয়মিত দাঁত মাজে না, খিলাল করে না। শুধু কেবল জার্ম কিলার লিকুইড বা জীবানু নাশক তরল পদার্থ দিয়ে কুলি করে নেয়। এতে মুখের দূর্গন্ধ তো দূর হয়ই না, বরং এতে দাতেরও ক্ষতি হয়।

গ. পোশাক পরিচ্ছদ : মুসলিম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলার ক্ষেত্রে পর পুরুষের সামনে সমস্ত শরীর ও নীচে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পোশাকে ঢেকে

রাখা ফরজ ও অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। পুরুষরা পোশাকে প্রায় পুরো শরীর ঢেকে রাখে, আর মহিলারা আন্ডার ওয়্যারের উপর স্কার্ট পড়ে যা অনেক সময় হাফ প্যান্ট থেকেও খাটো হয়ে থাকে। তা পরে কারো সামনে বসলে উরুর অংশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের এহেন কুরুচিপূর্ণ পোশাক দেখলে যুবকদের তো বটেই বৃদ্ধদেরও যৌনউম্মাদনার সৃষ্টি হয়। ফলে যুব সমাজ ধর্ষন, ব্যাভিচার, এসিড নিক্ষেপ,নারী অপহরণ, প্রভৃতি অপরাধে জরিয়ে পড়ে।

ঘ. বয়োবৃদ্ধ পিতা মাতা ও শশুর শাশুরীর প্রতি আচরণ : ইসলাম মাতা পিতার আদেশ মান্য করা ও তাদের প্রতি সদ্বব্যবহার করাকে অপরিহার্য করেছে। বিশেষত তারা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনিত হয়, তখন তাদের সামনে মন্দ ব্যবহার এমনকি বিরক্তি ভরে ‘উফ’ শব্দটি উচ্চারন না করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজে সবচেয়ে হতভাগ্য ও অবহেলিত মানুষ হলো বয়োবৃদ্ধ পিতামাতা ও শশুর শাশুরী। সেখানে বয়স্ক ছেলে মেয়েরা পিতা মাতার সংসারে থাকে না, অথবা পিতা মাতাকে ছেলে মেয়েদের সংসারে রাখা হয় না। তারা পৃথক জীবন যাপন করে। চলন শক্তি রহিত না হওয়া পর্যন্ত তারা হাট বাজার করে। জীবন শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের রান্না নিজেরাই করে। আর রান্না বা চলাফেরার শক্তি যখন না থাকে তখন রান্নার প্রয়োজন হয় না, এমন জিনিস খেয়ে বেচে থাকে। অনেক সময় একলা ঘরের মধ্যে মরে পরে থাকে। দূর্গন্ধ বের হলে প্রতিবেশী ফ্লাটের লোকেরা দরজা ভেঙে মৃতদেহ বের করে। আর যারা তাদের বয়ো বৃদ্ধ মাতা পিতাকে আরেকটু ভালো রাখতে চায়, তারা তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে/বৃদ্ধনিবাসে পাঠায়। বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি এমন অমানবিক নিষ্ঠুরতাই চলে পাশ্চাত্য সমাজে। তেমনি ভাবে আমেরিকান মূল্যোবোধে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বর্জনীয় বস্তু হলো শাশুরী। যাকে প্রথম সুযোগেই দূরে ফেলে দিতে হবে। তা না হলে তিনি পারিবারিক পরিবেশ দূষনীয় করবেন। তাই তারা ময়লা আবর্জনাকে তুলনা করে থাকে শাশুরীর সাথে। এবং নিত্যকার ময়লা দুর করার সময় বলে থাকে শাশুরীকে ফেলে দিয়েছি। কি অদ্ভুত এক সংস্কৃতি ?

ঙ. শিশুদের প্রতি আচরণ : ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত মিলন অবৈধ, তাই বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের জন্মের প্রশ্ন এখানে নেই এবং বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের হার খুবই কম বিধায় শিশুরা মাতা পিতার যৌথ ভালবাসায় বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। অধিকন্তু মহিলারা সন্তানদেরকে অনেক বেশী সময় দিতে পারেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ বহির্ভূত মিলন ও সন্তান নেয়ার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ না থাকায় এবং বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের হার খুব বেশী হওয়ায় মাতা পিতার ভালোবাসা খুব সন্তানের ভাগ্যেই জোটে। তাছাড়া পাশ্চাত্য বাসীরা নিজ শিশুদেরকে কোলে নেয়ার চেয়ে পোষা কুকুরকে কোলে নিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এভাবে শিশুরা অনাদারে অবহেলায় বেড়ে ওঠে। আবার পিতা মাতা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় সাথে নেয় ছোট শিশু এবং পোষা কুকুর। কুকুরের গলার বেল্টের সঙ্গে লাগানো চেইন ধরে মা হেটে চলেছেন তো বাবা হাঁটেন শিশুর কোমরে বেল্টের সঙ্গে লাগানো চেইন ধরে।যেন মানব শিশু আর কুকুর সমস্তরের জীব। মানবতার প্রতি এ কেমন লাঞ্ছনা? শুধু তাই নয় ছোট অবুঝ শিশুর সামনে খেলনা আর খাবার রেখে একটি লম্বা বেল্ট বা চেইন দিয়ে ঘরে বেধে মা শিশুর সামনে দিয়ে বয় ফ্রেন্ডের হাত ধরে ক্লাবে নাচতে চলে যান অথবা অন্য কোন ধান্দায় বেরিয়ে যান। বাবা মা একসঙ্গে থাকলে দু জনই বাইরে চলে যান। এদিকে কিছু ক্ষন খেলাধুলা করে অনেকক্ষন কেঁদে শিশুটি কাপড়েই পেশাব-পায়খানা করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। যে শিশুর প্রতি বাবা মা এমন নিষ্ঠুর আচরণকরতে পারেন, সে শিশুই বড় হয়ে বৃদ্ধ মা বাবাকে নিজের কাছে রেখে সেবা যত্ন করার পরিবর্তে দূরে বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে রাখে যেন তাদের সেই বাল্যকালেরই প্রতিশোধ নেয়।

চ. ছেলে মেয়ের ভরন পোষন : সাধারনত মুসলিম পরিবারে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা শেষ করে কোন পেশা বা কাজে নিয়োজিত না হওয়া পর্যন্ত পিতা মাতা ভরন পোষন দিয়ে থাকেন।আর মৃত্যুকালে অধিকাংশ সম্পদই উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তান-সন্ততির জন্য রেখে যান। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে সন্তান বড় হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদেরকেই নিজেদের পড়াশোনার খরচ উপার্জন করতে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েরা তাদের শিক্ষাব্যয়ের প্রায় অনেক টুকুই খন্ডকালীন যৌনকর্মী হিসেবে অর্জন করে থাকে।

ছাত্রীদের বিপুল যৌন আয় লক্ষ করে ইদানিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এ পেশায় প্রতিযোগিতামূলক ভাবে এগিয়ে এসেছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের চাহিদা ছাত্রীদের চেয়েও বেশী। অপরদিকে পাশ্চাত্যের ৯০ ভাগ লোকই মৃত্যুর পূর্বে নিজ সম্পদের ৮০-৯০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল,ইত্যাদির জন্য উৎসর্গ করে যান। তারপর কদাচিৎ সামান্য অংশই পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে যান।

ছ. বিয়ে ও যৌন চর্চা : একমাত্র বিবাহই ইসলামে নারী পুরুষের যৌন সম্ভোগ ও সন্তান লাভের বৈধ মাধ্যম। ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকার যৌনতা যেমন :- লিভ টুগেদার, সমকামিতা,পশু মৈথুন ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও মারাত্মক মহাপাপ। শুধু তাই নয়, বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ যৌনতা রোধের পদক্ষেপ হিসেবে ইসলাম বেগানা নারী-পুরুষের মাঝে পর্দার বিধানকে ফরজ ও আবশ্যকীয় করেছেন। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, যৌনতার আবর্তেই পাশ্চাত্য সমাজ ঘুরপাক খাচ্ছে। ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বহু খৃষ্টান দেশে যৌনরাজ্যের যে ভীতিপ্রদ চিত্র ভেসে উঠেছে, তা যে কোন শান্তি প্রিয় মানুষকে সন্দেহাতীতভাবে ভাবিয়ে তোলে। পুরুষ সমকামিতা, নারী সমকামিতা, অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা মেয়ের যৌন সম্পর্ক, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মেয়ের পরকিয়া, অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার একত্রে বসবাস প্রভৃতি আজ মার্কিন মুল্লুক, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ বহুদেশে অপরাধ বলে বিবেচিত নয়। এছাড়া পশু মৈথুনের মত জঘন্য যৌনতার চর্চাও আজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অবারিত। এভাবে করে পিতৃ পরিচয়হীন অবৈধ জারয সন্তানে ভরে উঠেছে পাশ্চাত্য দেশগুলো । সেখানে বিবাহ ও পরিবার প্রথা দিন দিন লোপ পাচ্ছে।

১৯৭১ সালের হিসেব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদের হার শতকরা ৬৩ ভাগ। বর্তমান অবস্থা এ থেকে সহজে অনুমান করা যায়। পাশ্চাত্যের মেয়েরা দেহদান করে ব্যয়ের একাংশ সংগ্রহ করে থাকে। একদিকে স্ত্রীরা দেহদান করে সংসারের আয় বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে স্বামীরা অবৈধ যৌনাচার করে প্রচুর অর্থ নষ্ট করে। বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা আর কাকে বলে!

উপরিউক্ত তুলনা মূলক আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরুপে প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে ইসলামী সংস্কৃতি সবদিক দিয়ে অতুলনীয় উন্নত, শালীন, মার্জিত, মঙ্গরজনক, ও কল্যানময়।পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসন অংশ টুকু অনুধাবন করলেও এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। এ ছাড়া আহার, নিদ্রা,শৃঙ্খলা, পারস্পারিক সম্পর্ক, বিবেচনাবোধ, উৎসব,অনুষ্ঠান, প্রভৃতি মানব জীবনের প্রয়েজনীয় সকল সাংস্কৃতিক উপাদান ও উপকরণের ক্ষেত্রে ইসলামে রয়েছে স্বচ্ছ, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান। যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অনুপস্থিত। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে বলাযায়, অনাবিল সুখ, শান্তি কল্যানময় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ও সংস্কৃতির কোন বিকল্প পৃথিবীর বুকে নেই।

ইসলামী অর্থনীতি এবং পাশ্চাত্য অর্থনীতি

ইসলামী অর্থব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত। যা মানুষকে সৎ পথে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য পথনির্দেশ করে। এ অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সম্পদের আমানতদার। এক্ষেত্রে সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগে হারাম ও হালালের ব্যবধান নিশ্চিত করা হয়। এ অর্থনীতি সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য যাকাত, ওশর, জিযিয়া ও ছাদাকাতুল ফিৎর ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, কালোবাজারী, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, চুরি, ডাকাতি, শোষণ, মজুদদারী, যুলুম প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা মানব রচিত। সময়ের আবর্তনে এ অর্থব্যবস্থা সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে। এমনকি এ তাত্ত্বিক বিবরণ (তথ্য-উপাত্তসমূহ) নির্দিষ্ট সময়ান্তে সনাতনী বা ধ্রুপদী (Classical) হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এ অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু কোন বিধি-বিধান না থাকায় সমাজে আর্থিক সমতার স্থলে হত-দরিদ্র, নিমণমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং ধনী ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। যা কোন দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে অক্ষম। সকল অর্থ ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন করা। এ লক্ষ্য

নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত অর্থব্যবস্থা সর্বদাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে (Vicious Circle of Poverty) বদ্ধাবস্থায় থাকে। বর্তমানে প্রচলিত অর্থনীতিকে বিজ্ঞানরূপে কেবল তার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক আলোচনা করে, নৈতিক দিক এক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। এ অর্থনীতিতে নিঃস্ব, ফকীর ও অসহায় মানুষের ভোগের প্রাধান্য প্রসঙ্গ হিসাবে আসে না। সম্পদ কুক্ষিগত করার যাবতীয় কৌশলের কথা বিশ্লেষিত হয়। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধ, সদাচরণ, বিত্তহীনদের কথা অলোচনায় আসে না। এতে সম্পদই মুখ্য, মানুষ নয়।

ইসলাম সমষ্টিগত কল্যাণ চায়, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি-গোষ্ঠীর নয়। আধুনিক অর্থনীতির দর্শনে মূল্যবোধ বিবেচিত হয় না এবং ইহজগত ও পরজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক কল্যাণের মূল লক্ষ্যও বিবেচিত হয় না। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং কিছু লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে সমাজে আয় বৈষম্য (Income inequality) সৃষ্টি করে, যা ইসলামী অর্থনীতি সমর্থন করে না। ইসলামী অর্থনীতি প্রীতি, সাম্য, মৈত্রী এবং আধ্যাত্মিকতার সাথে অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করে এক সর্বোত্তম মানবীয় রূপ দান করেছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোন দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী যেমন: উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, বিনিয়োগ, বিনিময়, বাণিজ্যের ধরন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক ও আইনগত রীতিনীতি গড়ে ওঠে। বর্তমান বিশ্বে যেসব অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার ছোট-খাট পার্থক্য বাদ দিলে বলা চলে, মোট তিন প্রকার অর্থব্যবস্থা বিশ্বে চালু আছে। আর তা হ'ল-

(১) ইসলামী অর্থব্যবস্থা

(২) ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

(৩) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়। এখানে ন্যায়বিচার এবং ইনছাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়। ধনীদের থেকে যাকাতের অর্থ

গরীব, অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বণ্টনের মধ্যে দিয়ে সমাজের সাম্য অর্জন করা হয়। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় এরূপ কোন ধরনের উদ্যোগ নেই। বরং এতে ধনীরা আরো ধনী হয় এবং গরীবেরা আরো গরীব হয়। ফলে গরীব লোকেরা মৌলিক চাহিদার প্রথম ধাপ- অন্ন (খাদ্য) দরিদ্রতার জন্য পরিমিতভাবে ভোগ করতে পারে না। এতে বিশ্বে ক্ষুধা নামক নীরব ঘাতকের হাতে প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাযার লোক মারা যাচ্ছে। ৮৫২ মিলিয়ন লোক ক্ষুধার্ত থাকে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BDRI) তথ্য অনুযায়ী দেশের ৫০ শতাংশ পরিবার বছরের কোন না কোন সময় খাদ্য সংকটে থাকে, ২৫ শতাংশ নিয়মিতভাবে সারা বছর খাদ্য পায় না, ১৫ শতাংশ পরিবার সবসময় পরবর্তী খাবার নিয়ে চিন্তিত থাকে এবং ৭ শতাংশ মানুষ কখনোই তিন বেলা খেতে পায় না।

বর্তমানে দেশের ৪০% মানুষ অতিদরিদ্র। প্রায় ২৮% মানুষ এক ডলারের কম আয়ে জীবনযাপন করছে। বিশ্বে প্রতিদিন না খেয়ে থাকে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ। অথচ উন্নত বিশ্বে প্রতি বছর খাদ্য অপচয় হয় ২২ কোটি টন।[2] প্রচলিত অর্থনীতি এরূপ মন্দা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে এসবের স্থান নেই। যাদের পণ্য ভোগ করার সামর্থ্য নেই ইসলাম তাদের মাঝে যাকাতের অর্থ ন্যায্য বণ্টনের মধ্যে দিয়ে দারিদ্র্য হ্রাস করছে। অর্থ-সম্পদ উপার্জনে হারাম-হালাল বিবেচনা, হালাল উৎপাদন, কর্মে নিযুক্ত থাকার নির্দেশ, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি, যাকাত ও ওশর ব্যবস্থার প্রবর্তন, কার্পণ্য ও সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা, সুষম বণ্টন, অপচয় ও অপব্যয় পরিহার, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা, সূদ-ঘুষ ও দুর্নীতি নিষিদ্ধ করা, শ্রমনীতি ও শ্রমের মর্যাদা, শোষণমুক্ত সমাজ, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, সমাজকল্যাণ, উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রভৃতি পন্থা বাস্তবায়নে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে।

উপসংহার

ইসলাম দুনিয়ায় এক মহত্তম আদর্শের উদ্বোধক। বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভূখণ্ডের কৃত্রিম ভেদ-রেখার ঊর্ধ্বে এটি এক বিশ্বজনীন চেতনা। এক আল্লাহর অকৃত্রিম বন্দেগী ও অখন্ড মানবিক সমতা হচ্ছে এই আদর্শের ভিত্তিভূমি আর এটাই মুসলিম জাতিসত্তার মূল উপাদান। তাই একটি আদর্শবাদী মুসলিম জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ইসলামী চিন্তা-দর্শনের ভিত্তিতে, তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় ইসলামী ভাবাদর্শের সার-নির্যাস আর তার সংস্কৃতিতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ইসলামের সূক্ষ্ম নান্দনিকতা। এ কারণে মুসলিম জাতিসত্তা দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসত্তা থেকে গুণগতভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবাদর্শে সমুজ্জ্বল।

ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিম জাতিসত্তার এটাই অনন্য বৈশিষ্ট্য আর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই দুনিয়ার জাতিসমূহের দরবারে মুসলিম জাতির অবস্থান ছিল আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর। জ্ঞানচর্চা, জীবন-সাধনা, রাষ্ট্র-শাসন সর্বত্রই মুসলমানদের হাতে ছিল 'আলাদীনের জাদুর চেরাগ'। তাদের নির্মিত নতুন সমাজ ও সভ্যতার স্পর্শে মাত্র চার দশকের মধ্যেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিরাট অঞ্চলে মানবতার নব-জাগৃতি ঘটেছিল এবং যুগ-যুগান্ত কালের অজ্ঞতার যবনিকা অপসৃত হয়েছিল। কোন বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা অঞ্চলের কারণে নয়, শুধুমাত্র ইসলামের জাদু-স্পর্শেই এই অভাবনীয় বিপ্লব সংঘটিত হতে পেরেছিল। এমনকি প্রথম তিন দশকের সংক্ষিপ্ত সময়-পরিসরে তৎকালীন দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহ এবং রোম ও পারস্যের ন্যায় দু'দুটি পরাশক্তি তাদের পদতলে এসে লুটিয়ে পড়েছিল।

আজ সেই মুসলিম জাতি শুধু নিজের প্রভাব প্রতিপত্তিই হারায়নি, অমুসলিম জাতিগুলোর কাছে সে করুণার পাত্রেও পরিণত হয়েছে। সময়ের বিবর্তনে তার আকার-আকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে বটে; কিন্তু তার আদর্শিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক গুণাবলী বহুলাংশেই লোপ পেয়েছে। কারণ ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিবর্তে মুসলমানরা আজ বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলের ভিত্তিতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়েছে যা তাদের জাতিসত্তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। তারা ইসলামী শিক্ষা-দর্শন পরিহার করে পাশ্চাত্যের জড়বাদী

শিক্ষাদর্শনকে গ্রহণ করেছে; তাদের সাহিত্যে নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তে ভোগবাদী চিন্তা-দর্শনের প্রতিফলন ঘটছে; তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিতে নির্মল সৌন্দর্য-বোধের পরিবর্তে উৎকট নগ্নতা ও অশ্লীলতা ছায়াপাত করছে। এর ফলে আজকের মুসলিম জনগোষ্ঠী নৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধ হারিয়ে কার্যত এক বিশৃংখল জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। এই চরম বিপর্যয় থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করার জন্যে আজকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষার; তার হারানো বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তাকে ফিরিয়ে এনে তাকে নতুনভাবে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার।

ইসলাম পৃথিবীতে নিছক রাজনৈতিক তা অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্য আসেনি। ইসলাম এসেছে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। মানুষের চিন্তা ও কর্মের এ পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টাকেই বলা হয় সামগ্রিক অর্থে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ফলে ইসলাম ছাড়া জীবন পরিচালনা মানেই হচ্ছে, অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা পরিচালিত হওয়া। আর অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা জীবন পরিচালনার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অসঙ্গতি ও ত্রুটিপূর্ণ জীবন যাপন করা। স্বাভাবিকভাবেই এ জীবন অসংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি শিকার হতে বাধ্য। এ জন্যই বলা যায়, পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া ছাড়া পরিপূর্ণ সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব নয়। তাই হযরত মোহাম্মদ সা.-এর জীবনে ও বাণীতে, যে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে তাই ইসলামী বা মুসলিম সংস্কৃতি বলে পরিচিত। আধুনিক বিশ্বে মুসলিম মিল্লাতের অনগ্রসরতা, তার মূল কারণ ইমলামী সংস্কৃতির চর্চার অভাব। ইসলামের যে মূল দাবি মানুষের চিন্তা ও কর্মের সংস্কার ও পরিশুদ্ধি, সে সংস্কার ও পরিশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত অর্থে মুসলমান হওয়া যায় না, সংস্কৃতিবানও হওয়া যায় না। তাই সংস্কৃতিবান হতে হবে প্রথম মুসলিম হতে হবে আর মুসলিম হতে হলে সংস্কৃতিবান হতে হবে। কারণ সংস্কৃতির নিজস্ব কোনো আদর্শ নেই। সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের আচরিত কর্মপ্রবাহের নাম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের ভিত্তিতে এ কর্মধারা পরিচালিত হলে তা হবে সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। তাই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। এক কথায় বলা যায়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী সংস্কৃতির লালন ও চর্চা অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র

[1]. খন্দকার আবুল খায়ের, অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা.

[2]. কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস).

[3].Wikipedia.

[4]. বুখারী হাদিসগ্রন্হ.

[5]. মুসলিম হাদিসগ্রন্হ.

[6]. হেদায়েত উল্লাহ, ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং.

[7]. মোহাম্মদ তানভীর আহম্মেদ ও অন্যান্য ইসলামি অর্থনীতি.

[8]. ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র).

[9].শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি - মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহিম.

[10].বিভিন্ন কলাম,সম্পাদকীয়,প্রবন্ধ।

[11].সমসাময়িক পত্রিকা (কালের কণ্ঠ,মানবজমিন, সমকাল.

[12]. google.com

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111600089/